KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৮, মহানির্বাণ মঠ রোড, কলি-২৯
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 2/2-3 3/1 3/2-3 3/4	Year of Publication : Oct-Dec 1977 July-Sep 1978 April 1979 Aug 1979 Condition : Brittle / Good ✓
Editor : মণীন্দ্র বক্সী (2/2-3) সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিভাব

সম্পাদক ॥ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

১

॥ সি. এম. ডি. এ. সমাচার ॥

কাগজে হয়ত দেখে থাকবেন যে গড়িয়ার কাছে বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলী এবং কসবার পেছনে পূর্ব-কলকাতা উপনগরীর জমি ভরাট করবার কাজ গত দু'একমাস আরম্ভ হয়েছে। প্রকল্প দুটি আকারেই বিরাট তাই নয় (প্রায় ৮০ হাজার লোকের বাসস্থান), - এর বিশেষত্ব হল যে এখানকার শতকরা ৮০ ভাগ জমি অপেক্ষাকৃত গরীব এবং নিম্ন আয়ের লোকেদের উপকারে আসবে।

প্রকল্প দুটি হাতে নেওয়া হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে কিন্তু কাজ আরম্ভ হল মাত্র সেদিন। এবার কাজে হাত দেওয়া হয়েছে স্থানীয় লোকেদের সম্মতিক্রমে এবং কাজ এগোবে সকলের সহযোগিতায়। ১৯৮২ সাল নাগাদ কাজ দুটি শেষ হলে কলকাতার বিবিধ সমস্যার কিছুটা সুরাহা হবে। কাজটা যাতে জোর কদমে চলে, তার জন্য আপনাদের সাহায্য, সহানুভূতি এবং সহযোগিতা চাইছি। আপনারা লক্ষ্য রাখুন যাতে বে-আইনীভাবে ঘর বাড়ী তৈরী না হয়, জমির অবৈধ লেন-দেন না হয় আর হাউসিং সোসাইটি গজিয়ে যেন পরিকল্পিত উপ-নগরীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হয়।

খোঁড়াখুঁড়ি করে লোকের অসুবিধার সৃষ্টি সি. এম. ডি. এ কেন, কেউই করতে চায় না। কিন্তু বহু দিনের অবহেলার পর উন্নয়নের কাজে হাত দিলে খোঁড়াখুড়ি করতেই হয় যেমন ধরুন জলের পাইপ। নতুন নতুন এলাকায় জল পৌঁছে দিতে এবং পুরনো এলাকায় সাপ্লাই বাড়াতে নতুন পাইপের সংযোজন অবশ্যই প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে একটা দরকারী কথা বলে রাখি। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে ভূগর্ভ জলাধারের কাজটা প্রায় শেষ। এখানে রাত্রিবেলার ধরে রাখা জল (৬০ লক্ষ গ্যালন) মধ্য কলকাতায় দিনের বেলায় সাপ্লাই দেওয়া হবে। এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে কয়েকটি বিরাট পাইপ লাইন বসানোর। সেটা বসাতে হবে মৌলালী থেকে আরম্ভ করে লেলিন সরণী দিয়ে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার পর্য্যন্ত। কাজেই এবার লেলিন সরণীতে খোঁড়াখুড়ি করতে হবে। অবশ্য জনসাধারণের অসুবিধের কথা বিবেচনা করে তিনটি পর্যায়ে কাজে হাত দেওয়া হবে। প্রথম পর্যায়ে মৌলালী থেকে তালতলা পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় পর্যায়ে তালতলা থেকে ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট পর্য্যন্ত এবং তৃতীয় পর্যায়ে ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট থেকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার পর্যন্ত।

এর জন্য ফুটপাত কেটে রাস্তাটা চওড়া করা হবে, লাইটপোষ্ট সরানো হবে, পুলিশী ব্যবস্থা থাকবে কিন্তু তা সত্ত্বেও যানবাহন চলাচলের এবং পদযাত্রীদের যাওয়া আসার কিছুটা অসুবিধে নিশ্চয়ই হবে। এসব কথা আপনাদের আগাম জানিয়ে রাখছি এই আশা নিয়ে যে বিস্তীর্ণ এলাকায় যদি জলকষ্ট স্থায়ীভাবে দূর হয়, তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই সাময়িক চলাচলের অসুবিধেটা সহ্য করবেন।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

সূচীপত্র

... পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র ... স্থাপিত ১৯৭...

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
বিশেষ যুগ্ম সংখ্যা
বিভাব : গ্রীষ্ম ১৩৮৬

বিশেষ রচনা : স্মৃতিচারণ

বনফুল। গৌরাঙ্গ ভৌমিক ১
কমল কুমার মজুমদার :
কমল কুমারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। উৎপল কুমার বসু ১৫
শব্দের প্রতিভা অভী সেনগুপ্ত ১৬
কমল কুমারের চিঠিপত্র ও অন্যান্য :
সম্পাদনা : সুব্রত চক্রবর্তী ১৭
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ৩০

প্রবন্ধ

উর্বশীর হাসি। শঙ্খ ঘোষ ৩৩
রবীন্দ্রনাথ, রেনেসাঁস ও জীবন জিজ্ঞাসা। শিবনারায়ণ রায় ৪৩

আলোচনা

বাংলা বানান প্রসঙ্গে। পবিত্র সরকার ৪৮

প্রবন্ধ

... ঠাকুর ৬০

ব্যক্তিগত রচনা

কী পড়ি। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৮০
আনন্দ বাগচী ৯০

ব্যক্তিগত রচনা

দীপেন্দ্রনাথ। প্রবীর সেন ৯৪

কবিতাগুচ্ছ

জয় গোস্বামীর কবিতা। শান্তি লাহিড়ী ১০০
জয় গোস্বামীর দীর্ঘ কবিতা ১০৪

শিল্প ভাবনা

সাম্প্রতিক সময়ের তিনটি নাটক। নৃপেন্দ্র সান্যাল ১১০

চিঠিপত্র

সুবোধ রায়। মতিলাল রায় চৌধুরী
অরুণ সেন। আলপনা রায়। অনুপ চৌধুরী। ১১৬
সম্পাদকীয় ১১৯

সম্পাদকমণ্ডলী

পবিত্র সরকার। প্রদীপ দাশগুপ্ত
সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়। কবিরুল ইসলাম।
সম্পাদকীয় দপ্তর : ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস।
কলিকাতা-৭০০০১৭

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী
অলংকরণ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়
কভার মুদ্রণ : দি র‍্যাডিয়েন্ট প্রোসেস

বিশেষ রচনা

[বনফুল, কমলকুমার মজুমদার এবং দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙালী সারস্বত মানসের এই তিন অতিপ্রিয় কথাশিল্পী আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁদের রচনা কাছে আছে, থাকবে। এঁদের প্রণাম জানাই। ব্যক্তিগত রচনা, চিঠিপত্র, আত্মভাষণ ও নিবেদিত কবিতায় বিভাবের তরফ থেকে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। কমলকুমার মজুমদার—অংশটুকুর সম্পাদনা, পাণ্ডুলিপি ও বিবলিওগ্রাফী তৈরী করে দিয়েছেন সুব্রত চক্রবর্তী, বনফুল অংশের গৌরাঙ্গ ভৌমিক, উভয়ের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ—সম্পাদক]

বনফুল : একটি সম্পূর্ণ জীবনের অসম্পূর্ণ শেষ অধ্যায়

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ বৃহস্পতিবার বনফুল তাঁর লেক টাউনের বাড়িতে (পি ৬৬, বি ব্লক, কলকাতা ৫৫) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ঘরের সামনে একতলার এক ফালি ছাদ। ছাদের ওপরে অজস্র গোলাপের ডাল, টবে, হালকা হাওয়ায় কাঁপছিল। এই ছাদে বসে তিনি বহুবার সূর্যাস্ত দেখেছেন, আকাশ দেখেছেন, নক্ষত্র দেখেছেন। তাঁর ধারণা ছিল, আকাশ-চর্চার পক্ষে পাঁচ ব্যাটারির একটা নতুন টর্চ মস্ত বড় হাতিয়ার। টর্চের আলো আকাশ-পথে বহুদূর গিয়ে সরু আঙুলের মতো হয়ে যায় এবং বাঞ্ছিত নক্ষত্রকে কোমলভাবে স্পর্শ করে।

মৃত্যুকালে তাঁর পাশে ছিলেন তাঁর ডাক্তার ছেলে অসীমকুমার মুখোপাধ্যায় এবং ছোট মেয়ে করবী। অদূরের আরেকটি রাত কাটাচ্ছিলেন তাঁর এন্‌জিনিয়ার ছেলে চিরন্তন মুখোপাধ্যায়। তাঁর চোখেও ঘুম ছিল না।

সন্ধ্যে থেকেই নাড়ির গতি অনিশ্চিতের আভাস দিচ্ছিল। ডাক্তাররা জবাব দিয়ে গেছেন। মধ্যরাত থেকে অসীমবাবু গীতা, চণ্ডী পাঠ করতে থাকেন। বিশেষ করে চণ্ডীর সেইসব স্তোত্র, যা দৈত্যনিধনের পূর্বে দেবতাদের

কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল। এবং 'আহবনীয়'র কিছু কিছু কবিতা। নিজের কবিতা অসীমবাবু তাঁকে পড়ে শোনাতে থাকেন……

জীবন মৃত্যু বলে কিছু নেই,
আছে শুধু আসা-যাওয়া।
দার্শনিকের শেষ কথা
খুঁজে পাওয়া।

তাঁর প্রস্থানের সময়, রাত চারটে, কাঁটায় কাঁটায়। অসীমবাবুর মতে, 'তিনি স্বর্গে গেলেন'। নাক্ষত্রিক সমাবেশ ছিল এইরকম : 'পূর্বাকাশে ধনু লগ্ন উঠছে। লগ্নপতি ও চতুর্থপতি অষ্টমে, কর্কটে তুঙ্গী। পঞ্চমপতি ও দ্বাদশপতি মঙ্গল মকরে, জাতকের লগ্নে তুঙ্গী। এবং এই দুই গ্রহ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছেন। চন্দ্র তখন বৃহস্পতির নক্ষত্র, পুনর্বসুতে ঢুকেছেন।'

শেষজীবনে, ১৯৬৮ সাল থেকে, তিনি ছিলেন কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা এবং স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রায় নিঃসঙ্গ। অবশ্য এই নিঃসঙ্গতা ছিল অতি ব্যক্তিগত একটি বোধের ব্যাপার, বাইরে থেকে অপ্রকাশ্য। লেখালেখির ফাঁকফোকরে তিনি নিয়মিত ছবি আঁকতেন, মূলত তেল রঙে। এইসব ছবি তাঁর অতি ব্যস্ত অবসর যাপনের সৃজনশীল নিদর্শন। শেষ সম্পূর্ণ ছবিটি ইঙ্গিতবাহী। ছবির সামনের দিকটিতে তিনি রচনা করেছেন, হরিণের শিংয়ের মতো কয়েকটি ডালপালা এবং পেছনে দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র। আরও একটি ছবি এঁকেছিলেন তিনি শেষ বয়সে। সে ছবির নাম, 'প্রহরী'। একজন স্বাস্থ্যবান পুরুষ বসে আছেন সে ছবিতে, লাঠি হাতে। তিনি বলতেন, 'এটি আমার জীবনের, সাহিত্যের, আদর্শের প্রতীক।'

তিনি ভালোবাসতেন নদী, পাখি, ফুল, আকাশ, নক্ষত্র। সেজন্য নাতনীর নাম রেখেছিলেন নদীর নামে, তিস্তা। তিস্তার কাছে তিনি বাঘের গল্প, কুমীরের গল্প, রূপকথার গল্প বলতেন, বানিয়ে বনিয়ে। নিজের শৈশবটাকে উজাড় করে দিতেন। সেগুলি লেখা হলে, ছোটদের জন্য বেশ বড়সড় একটা বই হতে পারত।

ঘুম থেকে উঠে, ভোরবেলা তিনি পাখির ডাক শোনার জন্য কান পেতে থাকতেন। এবং ডাক শুনে পাখির রঙ, আকৃতি, কোন অরণ্যের আদি-বাসিন্দা, ইত্যাদি বলে দিতে পারতেন। এক সময়ে পাখির পেছনে বিস্তর ঘোরাঘুরি করে একটা বইও লিখেছিলেন। সেই বইয়ের নাম 'ডানা'। 'ডানা'য়

তাঁর ব্যক্তিগত ভালোবাসার গোপন সুরভি মিশেছে অল্পস্বল্প। বিশেষ করে ব্যাঙ্গালোর ভিক্টোরিয়া হাসপাতালের এক স্কটিশ নার্সের উদ্দেশে লেখা একটি কবিতা আছে এ বইয়ে, রূপচাঁদের জবানীতে।

Eevening speaks in golden clouds
Morning speaks in light.
Flowers speak in scented petals
Lightning speaks in flight.
The manner in which they express
Is simple, plain and sweet.
But what we do, we human beings ?
We know not how to do it.
When the heart is full and feelings melting
We try to hide and alter.
When the eyes speak, the tougne denies,
Words fail or falter.
I know not how to word my feelings
How to call my Muse
I wish I had the knack of Nature
To sing in light and Muse.

শেষ জীবনেও মনেহয় এই নার্সটিকে তিনি নিঃশেষে ভুলে যেতে পারেননি, যদিও লীলাবতীর উনপঞ্চাশ বছরের সান্নিধ্যের স্নিগ্ধ ছায়ায় আচ্ছন্ন থাকতেন প্রায় সব সময়। শুভদৃষ্টির সময়ে দেখা লীলাবতীর একটা প্রতিকৃতি আঁকার চেষ্টা করে তিনি অলৌকিকভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। লীলাবতীই নাকি বারণ করেছেন তাঁকে। বলেছেন, 'থাক না এই পর্যন্ত। আর কি দরকার! বাকিটা থেকে যাক দূর আকাশের নির্জনতায় ইঙ্গিতময়।'

সকালে তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ ছিল দিনলিপি লেখা। তাঁর দিনলিপির নাম 'মর্জিমহল'। মর্জিমহলের পাতায় ফুটে উঠত তাঁর চলতি জীবনের ছবি। চাকর অর্জুন প্রাথমিক দেখাশোনার কাজ করত।

একটা উপন্যাসও লিখতে শুরু করেছিলেন তিনি মৃত্যুর আগে। চুয়াত্তর পৃষ্ঠা লিখেছিলেন। কিন্তু শেষ করে যেতে পারেননি। এমন কি নামকরণও না। এই উপন্যাসের নায়কের নাম 'আকাশবাসী'।

৩১ জানুয়ারী ১৯৭৯ তিনি তাঁর শেষ দিনলিপি লিখে গেছেন মৃতা স্ত্রী লীলাবতীকে উদ্দেশ করে। ১ ফেব্রুয়ারী সকালে ঘুম থেকে উঠতে গিয়ে টের পান, শরীর স্বাভাবিক নেই, অসম্ভব ভারি। চাকর অর্জুন তাঁকে উঠতে সাহায্য করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তারপরেও তিনি বেঁচেছিলেন পুরো নয় দিন। কিন্তু কোনো জীবিত মানুষের সঙ্গে কথা বলেননি। আমরা তাঁর চেতনাকালের শেষ দিনলিপিটি হুবহু উদ্ধৃত করছি :

"লীলা, বাঙালীরা আর একটা হুজুক পেয়েছে। নেতাজির ফোটো নিয়ে মকোর্দমা হচ্ছে কোর্টে। ক্রিকেট শেষ হয়েছে, এবার আমরা এই নিয়ে কিছুদিন মেতে থাকব। দেশে চুরি-ছিনতাই বাড়ছে, নানারকম অন্যায় অবিচার হচ্ছে, সেসব নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। ৮২ বছরের বুড়ো নেতাজি বেঁচে আছেন কিনা, তাই নিয়ে আমরা উন্মত্ত। অথচ তিনি যখন বেঁচে ছিলেন, আমাদের মধ্যে ছিলেন, তাঁর একটি কথাও শুনিনি আমরা। তিনি যখন I. N. A. সৈন্যের নেতাজি তখন তাঁকে আমরাই কুইসলিং বলেছি।

আজ তাঁকে নিয়ে একটা হুজুক করবার সুযোগ পেয়েছি আমরা। হতভাগাদের কিছু সময় কাটছে।

কাগজের অন্য খবর। চীনের সঙ্গে আমেরিকার বন্ধুত্ব পাকা হল—মিস্টার টেং এবং মিস্টার কার্টার বলেছেন, চিরস্থায়ী হল!

(১) কিন্তু হায়, বলছে সব
ঐতিহাসিক দল—
লক্ষ্মীর মতন পলিটিক্যাল
প্রেম বড় চঞ্চল।
ক্ষণে ক্ষণে পালিয়ে যায়,
ভেসে বেড়ায়,
স্বার্থের জোয়ার-ভাটায়।

(২) চিকমাগালুরে পাতা হবে
নির্বাচনের নেট,
ইন্দিরা কি আবার সেখানে
হবেন ক্যাণ্ডিডেট?"

তাঁর জন্ম ১৯ জুলাই ১৮৯৯ বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মনিহারী গাঁয়ের এক 'বুনো জায়গায়'। বাংলা ১৩০৬ সনের ৪ শ্রাবণ, সন্ধ্যেবেলা। ভালো নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। ছেলেবেলায় চাকরবাকরেরা ডাকত 'জংলীবাবু'। তিনি বলতেন, 'মৃত্যু শেষ পর্যন্ত মানুষকে জন্মের গন্তব্যে পৌঁছে দেয়।' এইজন্যে, শেষ জীবনের কথা বলতে বলতে, হঠাৎ, শৈশবের উল্লেখ করা হলো।

আত্মস্মৃতির কয়েক টুকরো

বিদেশী সাহিত্যের ঋণ

রবীন্দ্রনাথ আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, চেখভ পড়েছ? ও হেনরী?

সত্যিকথা বলতে কি, বিদেশী সাহিত্য আমার বিশেষ পড়া হয়নি। সেকথাই রবীন্দ্রনাথকে সঙ্কোচের সঙ্গে জানালুম।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, পড়ে দেখ। ভালো লাগবে।

তাঁর উপদেশ মেনে আমি চেখভ পড়েছিলুম। ভালো লেগেছিল। কিন্তু ও হেনরী বুঝতে পারিনি। দুর্বোধ্য ঠেকেছিল। চলতি আমেরিকান ইংরেজির গোলকধাঁধায় আমি পথ হারিয়েছিলুম।

মনে পড়ছে আরেকটি ঘটনা।

গল্প ছাপার সূত্র ধরে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম 'প্রবাসী' অফিসে। চারুবাবু একথা সেকথার পর জিজ্ঞেস করেছিলেন, বিদেশী কার কার লেখা আপনার ভালো লাগে?

কার নাম বলি? পড়া তো কিছুই হয়নি।

চারুবাবু আমার কথায় বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, পড়বেন। কন্টিনেন্টাল লিটারেচার আপনার পড়া উচিত।

তাঁর উপদেশ মেনে আমি কয়েকটা বই পড়েছিলুম। বার্নার্ড শ-র 'মিসেস ওয়ারেণস প্রফেসান' মেটারলিংকের 'ব্লু-বার্ড' এবং আর একটা বই—কি নাম যেন —হ্যাঁ, যোনাভানা।

তার পরেও কিছু কিছু বই। যা পড়েছি, কাজে লাগিয়েছি। এবং যার কাছ থেকে যা নিয়েছি, যেটুকু সাহায্য পেয়েছি, শ্রদ্ধার সঙ্গে তা স্বীকারও করেছি। পরের লেখাকে আমি কখনো নিজের বলে চালাইনি।

'নিরঞ্জনা' লিখেছি আনাতোল ফ্রাঁস-এর 'থেইস' অবলম্বনে। 'ভীমপলশ্রী' লিখেছি বন ট্রেভার্সের 'এ কাকু ইন দ্য নেস্ট' অবলম্বনে। 'নঞতৎপুরুষ'

লিখেছি ডষ্টয়ভস্কির 'দ্য ইটারনেল হাজব্যাণ্ড' অবলম্বনে। 'সীমারেখা' লিখেছি চেখভের 'ওয়ার্ড নাম্বার সিক্স' অবলম্বনে। পীতাম্বরের পুনর্জন্ম' লিখেছি চার্লস ডিকেন্সের 'ক্রিসমাস ক্যারোল' অবলম্বনে। আর ? আর, এল, ষ্টিভেনসনের 'প্রিন্স অটো' অবলম্বনে লিখেছি 'গন্ধরাজ'।

আরও একটা বই লিখেছি—বই না ঠিক, একাঙ্ক নাটক একটা 'কবয়'—ক্লিফোর্ড বক্সের 'পোয়েটেসটার্স অব ইশপাহান' অবলম্বনে। এটি আছে আমার 'দশভাণ' সঙ্কলনে। 'দশভাণ' এই নামকরণ করে দিয়েছিলেন পরশুরাম অর্থাৎ রাজশেখর বসু মশাই।

আমার কালের নানা হুজুগ

আমি যখন মেডিকেল কলেজে পড়ার জন্য কলকাতায় আসি, তখন বিদেশী নোংরা সাহিত্যের অনুকরণে এক ধরনের নোংরা সাহিত্যের আমদানী হয়েছিল। এই সাহিত্যের প্রচারকরা নিজেরাই নিজেদের 'বিদ্রোহী' আখ্যা দিয়েছিলেন। এবং উঁচু গলায় ঢাকঢোল পিটিয়ে নিজেদের মাহাত্ম্য জাহির করতেন।

আমার কাছে এই প্রচার অত্যন্ত খারাপ লাগত। নোংরা, একদম নোংরা ছিলেন এইসব লেখকেরা। সাহিত্যের পরগাছা বললেও ভুল হয় না। জীবনের সঙ্গে এঁদের কোনো যোগ ছিল না।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এঁদের কীর্তিকাহিনী ফলাও করে লিখে গেছেন 'কল্লোল যুগ' নামক একটা বইয়ে। লেখাটি ভালো। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোল যুগ' নামে কোনো যুগ নেই। ওটা একটা হুজুগ। হুল্লোড়ের যুগ।

এই হুজুগে লেখকেরা মাঝে মাঝে চুরি করে ধরা পড়ে যেতেন। কে কার আগে বিদেশী বই চুরি করে বাহবা নেবেন, তার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠতেন। এমন নির্লজ্জভাবে অন্যের লেখাকে নিজের নামে চালাবার চেষ্টা, সেই প্রথম। বাংলা সাহিত্যে কল্লোলের এটা একটা মস্ত বড় দান।

কল্লোলের লেখকেরা বাংলা সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেননি। তাঁরা গোলমালই করেছেন কেবল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—কেউই কল্লোলের লেখক না। অথচ বাংলা সাহিত্যিকে তাঁরাই ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে এসেছেন।

অনেকে আমাকে 'শনিবারের চিঠি'র লেখক মনে করেন। এটা ঠিক না। 'শনিবারের চিঠি'তে আমি অনেক লেখা লিখেছি—অনেক কবিতা, অনেক গল্প, অনেক উপন্যাস, নাটক, ফিচার। আমার 'ভূয়োদর্শন' অনেকের ভালো লেগেছিল।

সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি' মারফৎ নোংরা সাহিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। সে সাহিত্যের সমঝদার ছিল। লেখা চিনত, লেখক চিনত। এত ভালো সম্পাদক সে যুগে খুব বেশি ছিল না।

কিন্তু 'শনিবারের চিঠি'র অনেক দোষও ছিল। অনেক নোংরা লেখা 'মণিমুক্তা' নাম দিয়ে ছাপা হত। তাতে কাগজের ও সম্পাদকের সুরুচির পরিচয় পাওয়া যেত না। রবীন্দ্রনাথের মতো লেখককেও এই কাগজ রেহাই দেয় নি।

আমার কাছে এইসব ব্যাপার আশ্চর্যজনক মনে হত।

নজরুলকে দেখেছি রীতিমতো বিখ্যাত কবি হিসেবেই। নজরুল সঠিক আর্থেই বিদ্রোহী ছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে প্রায়ই কোনো না কোনো মহিলাকে দেখেছি। এটা আমার ভালো লাগত না।

আমি যখন লিখতে শুরু করি, তখন কারো প্রভাব অতিক্রম করে যাওয়ার কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি। আমার বিশ্বাস, কোনো মানুষই তা ভাবে না। অথচ আমার কালে এইসব ঘটেছে।

মোহিতলাল মজুমদার বলতেন, তিন ব-কারে মিলে বাংলা সাহিত্যের সর্বনাশ করছে। বোলপুরে থাকতেন রবীন্দ্রনাথ, বালিগঞ্জে প্রমথ চৌধুরী এবং বেহালায় দীনেশ সেন। রবীন্দ্রনাথের অমিল পয়ার ও শেষ জীবনের গদ্যছন্দকে মোহিত বাবু অপছন্দ করতেন।

আত্মজীবনী কিংবা চেনা মানুষের জীবনী

এক হিসেবে আমার অনেক লেখাই আমার আত্মজীবনী কিংবা চেনা মানুষের জীবনী। বাবাকে নিয়ে লিখেছি 'উদয়-অস্ত'; বাবার কম্পাউণ্ডার দুর্যোধন মণ্ডলকে নিয়ে লিখেছি 'অর্জুন মণ্ডল'; মাস্টার মশাই বনবিহারী মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে 'অগ্নীশ্বর', লীলাবতীকে নিয়ে 'লী', বাবার বন্ধুর দাদা অনুকূলবাবুকে নিয়ে 'ভুবন সোম', এবং আমার ডাক্তারী জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে 'তৃণখণ্ড', 'নির্মোক', 'হাটেবাজারে', ইত্যাদি।

বিয়ের পর, নববিবাহিতা পত্নী লীলাবতীকে আমি অনেকগুলি প্রেমপত্র লিখেছিলুম। অনেক প্রেমের কবিতাও। সেগুলি প্রকাশের যোগ্য ছিল না। ফলে কোথাও ছাপতে দিইনি। লীলাবতীকে লিখতুম, লীলাবতী বাক্সবন্দী করে রাখত।

পরে প্রেমপত্রগুলির কয়েকটি ভাষা পালটে, সামান্য এদিক সেদিক করে, 'কষ্টিপাথর' উপন্যাস লিখেছি। অনেকদিন পর প্রেমের কবিতাগুলি সুরেশ—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, তাঁর 'উত্তরা' কাগজে বের করেছিল।

লীলাকে নিয়ে আমি অনেকগুলি সনেট লিখেছিলুম এককালে। সজনীকান্ত দাস সেগুলি দু-কিস্তিতে শনিবারের চিঠিতে ছাপিয়েছিল। পরে বই আকারে বেরোয়। সে বইয়ের নাম 'চতুর্দশপদী'। আমার ছবি-আঁকার সূত্রপাতও লীলাবতীকে লেখা চিঠিতে।

'জঙ্গম'-এ বাস্তবের ঘটনা আছে অনেক। আছে বাস্তবের অনেক চরিত্র। শেওড়াফুলি থেকে যখন আমি ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করতুম, তখনকার রেলযাত্রীদের জীবন, মির্জাপুর স্ট্রিটের মেস আর ডায়মণ্ড বোর্ডিং হাউসের বন্ধুবান্ধবেরা এ উপন্যাসে আছে অল্পবিস্তর। আর আছে আমার বন্ধু ও সহপাঠি শিবদাস বসু মল্লিক। 'জঙ্গম'-এর ভন্টু চরিত্র তারই আদর্শে রচিত ও কল্পিত।

শিবদাস ছাড়া, আছেন আমার কলকাতার জীবনের লেখক বন্ধুরা। বিশেষ করে শনিবারের চিঠিতে যারা আড্ডা দিতেন, তাঁরা। মোহিতলাল মজুমদার উপন্যাসটি পড়ে ভারি রাগ করেছিলেন।

এ উপন্যাসে নাকি সজনীর চেয়ে আমি তাকে খাঁটো করে এঁকেছি। এটা ঠিক নয়। মোহিতবাবুকে আমি শ্রদ্ধা করতুম। আজও করি।

'জঙ্গম'-এর শঙ্কর (সজনীকান্ত দাস?) দোষেগুণে মানুষ। তার চরিত্রে স্খলন আছে, পতন আছে। এইসব থেকে সে বেরিয়ে আসতে চায়। স্খলনটা তার জীবনে সত্য নয়।

উপন্যাসটি নিয়ে অনেক ঝড় ঝাপটা গেছে; অনেক মনোমালিন্য হয়েছে। অথচ কাউকেই আমি ছোট করতে চাইনি, বড় করতেও না। এ উপন্যাসে আমার নিজের কথা আছে অনেকটা। আছে আমার তখনকার জীবন ও চলাফেরার খবরাখবর।

আমাকে লেখা মোহিতলাল মজুমদারের চিঠি

…'জঙ্গম' প্রথম খণ্ড পাইয়াছিলাম তারপর আর কোন খণ্ড পাই নাই।

আপনার আদর্শ চরিত্র, জঙ্গমের যিনি নায়ক, তাঁহার কাহিনী আপনার হাতে কেমন কাব্যশ্রী লাভ করিয়াছে তাহা দেখিবার ইচ্ছা ছিল; তখন মনে হয় নাই যে তাহার counterfoil হিসাবে আমার চরিত্রটাও আবশ্যক হইবে। আপনারা আর্টিস্ট, আপনাদের প্রয়োজনের তো অন্ত নাই! বাস্তবকে লইয়া যখন রসসৃষ্টি করিতে হয়, তখন কল্পনা একটু অধিক স্বাধীনতা দাবী করিবেই। শঙ্করের কাহিনী আপনি জানেন (যতটা জানা সম্ভব এবং আবশ্যক) কিন্তু আমার কাহিনীতো জানেন না; তথাপি যেটুকু সাক্ষাতে দেখিয়াছেন এবং যাহা শুনিয়াছেন (অতি মূল্যবান সাক্ষ্য তাহাতে সন্দেহ নাই) এবং আমার যে সাহিত্যিক personality আপনার মত রসিক ব্যক্তির ভয় ভক্তি ও জুগুপ্সা উদ্রেক করে, এই সকল হইতে আপনি একটি পরম রমণীয় রসবিগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছেন শুনিয়াছি। এখনও দেখি নাই, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে? অতিশয় অসাহিত্যিক পাঠক যাহারা তাহারাই ইহার রস বুঝিবে না, আমার চারিত্রিক পরিচয় হিসাবেই উহা মূল্যবান মনে করিবে (শুনিলাম উহাতে স্ত্রীকে প্রহার করাও আছে), কিন্তু আপনি সেদিকে দৃষ্টি না করিয়া আমাকে রসিক হইতে অনুরোধ করিয়াছেন অর্থাৎ প্রাকৃত জনসুলভ মনোবৃত্তির বলে যেন ক্ষুব্ধ না হই। আমার সাহিত্যিক আত্মার অচল-প্রতিষ্ঠ রসিকতার প্রতি আপনার শ্রদ্ধাই আমাকে বিচলিত করিয়াছে। আমি সত্যই রসের ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিয়াছি, শুধুই সাহিত্যিক মান-অপমান নয়, আমার ব্যক্তিগত কোন অনুভূতিও নাই! সত্যই কি আমি দেহধারী জীব নই! এতদিন কি আমি আপনাদিগকে এমনই প্রতারিত করিয়াছি! লোকে বলিতেছে ঐ চরিত্র আমারই, লোকে তো আর্ট বোঝে না। আপনিও বলিতেছেন উহাতে আমার চরিত্রের 'ছাপ' আছে, সে ছাপটা কালির দাগ না রঙের ছাপ? আপনার নায়কের স্বগভীর মনুষ্যত্ব আরও উজ্জ্বল হইয়াছে ত?

…আমার দিন খুব সম্ভব ফুরাইয়া আসিয়াছে। জীবনে আমি আমার জন্য কিছুই চাই নাই। মৃত্যুকেও ভয় করি না। কেবল দুঃখ হয়, কি দেখিয়া গেলাম! এ যুগে এ সমাজে স্বার্থ ছাড়া কি আর ধর্ম নাই! ঐ স্বার্থ ব্যক্তির আধ্যাত্মিক শক্তির সহায়ে দিকে দিকে কি মিথ্যা মহিমায় মণ্ডিত হইতেছে! জীবনের সহিত সাহিত্যের সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ ও নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে যে, পিশাচই দেবতার ছদ্মবেশে পূজা আদায় করিতেছে, এবং দেবত্ব ঘৃণিত ও বিকৃত হইতেছে! আমি বড় নই। কিন্তু বড়ত্বের স্পৃহা আমার ছিল।…(বাগনান থেকে, লেখার তারিখ ১৪-৩-৪৬)।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম আলাপ

১৯৩৭ কি ৩৮ সালের ঘটনা। কে এক রামচন্দ্র ঝা কালীঘাটে এসে পাঁঠা-বলির বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ শুরু করেন। আর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বাহবা দিয়ে 'প্রবাসী'তে লিখে ফেললেন একটা কবিতা।

আর যায় কোথা। আমিও ছাড়বার পাত্র নই। রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে একটা ব্যঙ্গ কবিতা লিখে ফেললুম। ভাবলুম, এবার কবিগুরুকে একচোট নেওয়া গেছে।

কবিতাটি বেরুবার দিন কয়েক পরে কলকাতায় আমার এক প্রাক্তন কংগ্রেসী বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বন্ধুটি বলল, তোমার কবিতা পড়ে গুরুদেব ভারি খুশি হয়েছেন। তা যাও না কেন একদিন তাঁর কাছে। গেলে তিনি খুশি হবেন।

আমি বললুম, ভাই অতবড় লোকের দরবারে যেতে ভয় হয়। তাছাড়া, আমি ব্রাহ্মণ এবং ডাক্তার। 'কল' না পেলে কোথাও যাই না।

আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল দিন কয়েক পর। রবীন্দ্রনাথের চিঠি পেলুম। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, আগামী অমুক তারিখে বসন্তোৎসব হবে। সপরিবারে এলে খুশি হব। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনীয়। ইত্যাদি।

চিঠি পেয়ে লজ্জাও পেলুম কম না। বাধ্য হয়ে শান্তিনিকেতনে যেতে হল। সঙ্গে নিয়ে গেলুম, ঘরের দুধে তৈরী খানিকটা সন্দেশ।

রবীন্দ্রনাথ একটা সন্দেশ মুখে পুরে দিয়ে বললেন, এ সন্দেশ তুমি ভাগলপুরে পেলে কি করে?

আমি লীলাকে দেখিয়ে বললুম, ইনি করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, এ যে ভারি চিন্তার কারণ হল। বাংলাদেশে দুটিমাত্র রসস্রষ্টা ছিল। প্রথম দ্বারিক, দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ যে দেখছি তৃতীয় লোকের আবির্ভাব হল।

তারপর রবীন্দ্রনাথ আমাদের খবরাখবর নিলেন। কোথায় উঠেছি না উঠেছি জানতে চাইলেন। এবং বললেন, তোমার লেখা পড়ে মনে হয়, তুমি ঝাল খেতে ভালবাস। বিকেলে কাবলে মটরের ঘুগনি করলে কেমন হয়? ঘুগনির মাঝখানে একটা লাল লঙ্কা গোঁজা থাকবে।

আমি বললুম বেশ তো!

রবীন্দ্রনাথের পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন সুধাকান্তদা—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন, বলডুইন, বলাইকে আজ ভালো করে ঘুগনি খাওয়াও। লাল লঙ্কা যেন থাকে।

সুধাকান্তদার মাথায় প্রকাণ্ড টাক ছিল। সেজন্যে রবীন্দ্রনাথ তাকে আদর করে 'বলডুইন' ডাকতেন।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, তোমার নাম 'বনফুল' দিয়েছিল কে? তোমার নাম হওয়া উচিত ছিল 'বিছুটি'। দু'এক ঘা যা দিয়েছ তার জ্বলুনি এখনো যায়নি।

বনফুলের পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী

১৯২৯ (১) বনফুলের কবিতা ॥ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস।

১৯২৯-৩০ (২) বনফুলের গল্প ॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স।

১৯৩৫ (৩) তৃণখণ্ড ॥ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস।

১৯৩৬ (৪) বৈতরণী তীরে ॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স।

১৯৩৭ (৫) দ্বৈরথ ॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স (৬) কিছুক্ষণ ॥ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস।

১৯৩৮ (৭) বনফুলের আরও গল্প ॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড সন্স। (৮) মন্ত্রমুগ্ধ ॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স। (৯) রূপান্তর ॥ মিত্র ও ঘোষ।

১৯৩৯ (১০) শ্রীমধুসূদন ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী।

১৯৪০ (১১) অঙ্গারপর্ণী ॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স (?) (১২) চতুর্দশপদী ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী। (১৩) মৃগয়া ॥ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। (১৪) নির্মোক ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী।

১৯৪১ (১৫) রাত্রি ॥ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস।

১৯৪২ (১৬) বিদ্যাসাগর ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী। (১৭) ভুয়োদর্শন ॥ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। (১৮) সে ও আমি ॥ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস।

১৯৪৩ (১৯) আবহনীয় ॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স। (২০) বাহুল্য ॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স। (২১) জঙ্গম (১ম ভাগ)॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড সন্স (২২) মধ্যবিত্ত ॥ ডি, এম লাইব্রেরী।

১৯৪৪ (২৩) বিন্দু বিসর্গ ॥ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস (২৪) দশভাণ ॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স।

১৯৪৫ (২৫) জঙ্গম (দ্বিতীয় ভাগ)॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স

(২৬) কঞ্চি ॥ ইণ্ডিয়ান এসো পাবলিশিং কোং (২৭) সপ্তর্ষি ॥ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস।

১৯৪৬ (২৮) অগ্নি ॥ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস (২৯) নঞ্চৎপুরুষ ॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স। (৩০) অদৃশ্যলোকে ॥ মিত্র ও ঘোষ। (৩১) সিনেমার গল্প ॥ মিত্র ও ঘোষ। (৩২) স্বপ্নসম্ভব ॥ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস।

১৯৪৭ (৩৩) আরও কয়েকটি ॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স।

১৯৪৮ (৩৪) বন্ধনমোচন ॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স। (৩৫) ডানা (১ম ভাগ) ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী। (৩৬) মানদণ্ড ॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স।

১৯৪৯ (৩৭) ভীমপলশ্রী। ইণ্ডিয়ান এসো পাবলিশিং কোং। (৩৮) করকমলেষু ॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স। (৩৯) নবদিগন্ত ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী।

১৯৫০ (৪০) ডানা (২য় ভাগ) ডি, এম লাইব্রেরী।

১৯৫১ (৪১) কষ্টিপাথর ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী। (৪২) স্থাবর ॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স।

১৯৫২ (৪৩) তন্বী ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী।

১৯৫৩ (৪৪) উত্তর ॥ বিহার সাহিত্য ভবন।

১৯৫৪ (৪৫) লক্ষ্মীর আগমন ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী। (৪৬) নবমঞ্জরী ॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স। (৪৭) পিতামহ ॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স। (৪৮) বিষম জ্বর ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী।

১৯৫৫ (৪৯) নিরঞ্জনা ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী। (৫০) পঞ্চপর্ব ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী। (৫১) শিক্ষার ভিত্তি ॥ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং (৫২) ঊর্মিমালা ॥ শান্তি লাইব্রেরী।

১৯৫৬ (৫৩ রঙ্গনা ॥ ইণ্ডিয়ান এসো পাবলিশিং কোং।

১৯৫৭ (৫৪) ভুবন সোম ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী।

১৯৫৮ (৫৫) অনুগামিনী ॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স। (৫৬) বনফুলের ব্যঙ্গ কবিতা ॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স। (৫৭) ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ॥ অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির। (৫৮) করবী ॥ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং। (৫৯) মহারাণী ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী।

১৯৫৯ (৬০) অগ্নীশ্বর ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী। (৬১) বনফুলের রচনা সংগ্রহ ॥ মিত্র ও ঘোষ। (৬২) জলতরঙ্গ ॥ ইণ্ডিয়ান এসো পাবলিশিং কোং।

(৬৩) নূতন বাঁকে ॥ ইণ্ডিয়ান এসো পাবলিশিং কোং। (৬৪) উদয়-অস্ত (প্রথম ভাগ) ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী।

১৯৬০ (৬৫) দুই পথিক ॥ ইণ্ডিয়ান এসো পাবলিশিং কোং। (৬৬) ওরা সব পারে ॥ ইণ্ডিয়ান এসো পাবলিশিং কোং। (৬৭) সপ্তমী ॥ নিওলিট!

১৯৬১ (৬৮) ছোটদের ভালো ভালো গল্প ॥ শ্রীপ্রকাশ ভবন। (৬৯) দূরবীণ ॥ বাক্‌সাহিত্য। (৭০) হাটে বাজারে ॥ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং। (৭১) তিন কাহিনী ॥ গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৬২ (৭২) গল্প সংগ্রহ (১ম ভাগ) ॥ ইণ্ডিয়ান এসো পাবলিশিং কোং (৭৩) মনন ॥ সেকাল একাল। (৭৪) দশভাণ ও আরও কয়েকটি ॥ ইণ্ডিয়ান এসো পাবলিশিং কোং। (৭৫) কন্যাসু ॥ ইণ্ডিয়ান এসো পাবলিশিং কোং (৭৬) সীমারেখা ॥ ন্যাশনাল বুক হাউস।

১৯৬৩ (৭৭) মনিহারী ॥ গ্রন্থ প্রকাশ। (৭৮) পীতাম্বরের পুনর্জন্ম ॥ ইণ্ডিয়ান এসো: পাবলিশিং কোং। (৭৯) ত্রিবর্ণ ॥ ইণ্ডিয়ান এসো: পাবলিশিং কোং।

১৯৬৪ (৮০) বর্ণচোরা ॥ এম, সি, সরকার। (৮১) পক্ষিমিথুন ॥ ইণ্ডিয়ান এসো পাবলিশিং কোং। (৮২) আলোর পিপাসা ॥ গ্রন্থপ্রকাশ।

১৯৬৫ (৮৩) ছিটমহল ॥ গ্রন্থ প্রকাশ। (৮৪) গল্প সংগ্রহ (২য় ভাগ) ॥ ইণ্ডিয়ান এসো পাবলিশিং কোং।

১৯৬৬ (৮৫) গন্ধরাজ ॥ আনন্দধারা প্রকাশন। (৮৬) মানসপুর ॥ ইণ্ডিয়ান এসো পাবলিশিং কোং। (৮৭) তীর্থের কাক ॥ ইণ্ডিয়ান এসো পাবলিশিং কোং। (৮৮) গল্প সংগ্রহ (৩য় ভাগ) ॥ ইণ্ডিয়ান এসো পাবলিশিং কোং। ১৯৬৭ (৮৯) এক ঝাঁক খঞ্জন ॥ বাক্ সাহিত্য। (৯০) রবীন্দ্রস্মৃতি ॥ ইণ্ডিয়ান এসো: পাবলিশিং কোং। (৯১) প্রচ্ছন্ন মহিমা ॥ ইণ্ডিয়ান এসো পাবলিশিং কোং (৯২) দ্বিজেন্দ্র দর্পণ ॥ বুক ল্যাণ্ড।

১৯৬৮ (৯৩) সত্যনিষ্ঠায় অনন্য নেতাজী চরিত্র ॥ নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো।

১৯৬৯ (৯৪) অধিকলাল ॥ বাক্ সাহিত্য। (৯৫) অসংলগ্ন ॥ আনন্দ পাবলিশার্স। (৯৬) গোপালদেবের স্বপ্ন ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী।

১৯৭০ (৯৭) রূপকথা এবং তার পর ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী। (৯৮) রৌরব ॥ আনন্দ পাবলিশার্স।

১৯৭১ (৯৯) বঙ্গতুরঙ্গ ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী। (১০০) স্বরসপ্তক ॥ ডি, এম লাইব্রেরী। (১০১) তুমি ॥ করুণা প্রকাশনী।

১৯৭২ (১০২) সন্ধিপূজা ॥ প্রকাশ ভবন। (১০৩) এরাও আছে ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী (১০৪) কৃষ্ণপক্ষ ॥ ডি, এম, লাইব্রেরী।

১৯৭৪ (১০৫) উদয়-অস্ত (২য় ভাগ) ॥ ডি, এম লাইব্রেরী। (১০৬) নবীন দত্ত ॥ মণ্ডল ব্রাদার্স। (১০৭) আশাবরী ॥ মিত্র ও ঘোষ।

এছাড়া, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কিংবা অপ্রকাশিত বই : (১০৮) প্রথম গরল (১০৯) সাত সমুদ্র তের নদী (১১০) ত্রিনয়ণ (১১১) লী (১১২) পশ্চাৎ পট (১১৩) ভাষণ (১১৪) হরিশ্চন্দ্র (১১৫) অলঙ্কারপুরী (১১৬) মায়াকানন (১১৭) চতুরঙ্গ (১১৮) দিবস্যামিনী (১১৯) মর্জিমহল ॥ দিনলিপি ॥ (১২০) একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস, যার নামকরণ তিনি করে যেতে পারেননি। এই উপন্যাসের নায়কের নাম 'আকাশবাসী'। পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা-সংখ্যা চুয়াত্তর।

এই তালিকাভুক্ত যেসব উপন্যাস, গল্প কিংবা নাটক চলচ্চিত্রায়িত বা মঞ্চস্থ হয়েছে বা হচ্ছে, সেগুলি হল যথাক্রমে (১) মন্ত্রমুগ্ধ (২) দ্বৈরথ (৩) মান-দণ্ড (৪) ভীমপলশ্রী ('একরাত্রি') (৫) অর্জুন মণ্ডল (৬) হাটে-বাজারে (৭) ভুবন সোম (৮) শ্রীমধুসূদন (৯) বিদ্যাসাগর (১০) কঞ্চি (১১) কবয়ঃ (১২) প্রচ্ছন্ন মহিমা (১৩) অধিককাল (১৪) মৃগয়া (১৫) অশ্বীশ্বর। (১৬) তিলোত্তমা ইত্যাদি।

* বনফুলের এই গ্রন্থপঞ্জীটি বনফুলের জীবিতকালে রচিত এবং বনফুল কর্তৃক সংশোধিত। আমরা পেয়েছি তাঁর ছোট ছেলে চিরন্তন মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে।

কমলকুমার মজুমদারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

উৎপলকুমার বসু

যে-সারল্য কবিতার কাছে আমি খুঁটে খাই, তুমি
কিছু তার ভেঙে নাও। হাত পাতো। দূর বনভূমি
তুরগতুরঙ্গ রবে ভরে যায়। তাদের পায়ের শব্দে
পাথরনদীর তীর কেঁপে ওঠে। এই অন্ধে
যা-কিছু উৎপন্ন হল খেতে, মাঠে কামারশালায়
প্রবাসী দস্যুরা এসে অকাতরে কেড়ে নিয়ে যায়।

কবিতার কাছাকাছি বসে থাকি আমি আর শুধু সরলতা।
এই যুদ্ধ শেষ হলে, এ-আগুন নিভে এলে লতা,
সাপ ও বৃশ্চিক সার বিক্রি করি। উপার্জন কম
তাই অপব্যয় আমাকে সাজে না। জেনো, যাদের বিভ্রম
রণে, রক্তে, অশ্রুপাতে ক্রমশ প্রকাশ হল—তারই বংশধর
আমি দূত, গোপনসংবাদবহ, উভয়ত চর।

গন্ধ শুঁকে উঠে আসছে একদল রূপালি কুকুর
পদচিহ্নে নাক গুঁজে, সন্দেহতাড়িত ভূত দ্বিমুখী অসুর
সেচজমি বাঁয়ে ফেলে, উত্তরের টিলা ও পাহাড়
পর্যবেক্ষণ শেষে—জানি, মেনে নেব হার
এ-মুহূর্তে, পরের প্রহরে, নয় উৎসবে কাল
দেখো কেমন বাতাসে দোলে আমাদের মরণান্ত ছাল।

আজ কবিতার কাছাকাছি বসে আছি লিপিকার। ঐ সরলতাখানি
আমার প্রাণের পরে নুয়ে আছে। কিছু ফুল ঝরছে সন্ধানী
ফলের, বীজের সাথে। খাদ্যসম তুলে নিই তাকে
খুঁটে খাই, হাত পাতি, বিষের আত্মাকে
মানুষ যে-ভাবে জানে অপমরণের আগে, জেনো সেই মতো স্থির
সারল্যের পাশাপাশি শুয়ে থাকি আমি আর কবিতার অটুট শরীর।

শব্দের প্রতিভা

অভী সেনগুপ্ত

শোকের বাক্যবন্ধ কত যোগান দিতে পারে বাঙলাভাষা? কত?

৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ কমলকুমার মজুমদারের মৃত্যুর মত ঘটনার কাছে সমস্ত ভাষা, যুক্তি এবং শোককে-হার-মানানো সময়ের তীরন্দাজী স্তব্ধ হয়ে গেছে।

বাঙলাসাহিত্যের বহমান নদীশরীরকে তাঁর সৃষ্টি, কোঁকড়ানো ঢেউ হয়ে সৌন্দর্য্য এনে দিয়েছে অথচ নাব্যতার প্রয়োজনে, সেই নদীশরীরে সুস্বাস্থ্য এনে দেবার কারণে তাঁর সাহিত্যজীবন আপাদমস্তক ড্রেজারের ভূমিকা পালন করেছে। মাত্র চৌষট্টি বৎসর পরমায়ু নিয়ে স্রষ্টা কমলকুমার তাঁর বঙ্গভূমি হিসাবে বিংশ শতাব্দীকে বেছে নিয়েছিলেন এটা শিল্পসাহিত্য এবং এই শতাব্দী উভয়পক্ষেরই উল্লেখযোগ্য কারণ হিসাবে ভাবা যায়।

তাঁর বিশাল সৃজনক্ষমতা থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের শিল্পমাধ্যম কত নব নব রূপে উপকৃত ও অনুকৃত হবে সেই অন্যতম কর্তব্যপালনের জন্যই লেখা হয়ে থাকে ইতিহাস। কিন্তু আমরা, যারা কী জানি কোন পুণ্যের ফলে, তাঁকে অতি কাছ থেকে দেখেছি - তাঁর তীক্ষ্ণ মনুষ্যত্ব ও মনীষার হীরকদীপ্তিতে আলোকিত হয়েছি—তাদের ক্ষতির হাহাকার কখনো কী মিলিয়ে যেতে পারে। ৬৮ থেকে ৭৯—এই কয় বৎসরে, আমার জীবন তাঁর সান্নিধ্যস্নেহে বেড়ে উঠেছিল - এই সময়েই আমি জেনেছি বাঙালীয়ানার অহঙ্কার ও তার সঙ্গত কারণ, বিস্ময়করভাবে কুৎসিত বেঁচে-থাকার পরিমণ্ডলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। একটি মনীষার নিরন্তর কর্মস্পৃহা এবং শিল্পসাহিত্যের আনাচকানাচ থেকে—কাগুজে ফুল নয়—প্রকৃত পুষ্পবন চেনার কারণ ও সার্থকতা। কমলকুমারের রসবোধ তাঁর ঋজুতার সংগে পাল্লাস্বরূপ সমান্তরাল। তাঁর দর্শনলাভ, তাঁর বাচন-ভঙ্গীর সংগে পরিচয়—একটি আশ্রমের দিকে নিয়ে যেত। প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও রসবোধের সমন্বয়ে আমার দেখা সম্পূর্ণ বাঙালীদের নাম জিজ্ঞাসা করলে আমি আজীবন কমলকুমারের সর্বাগ্রে কথা বলে যাব।

তাঁর সংগে আমার প্রথম সাক্ষাৎ থেকে এযাবৎকাল একটি ক্ষুদ্র যুবককে প্রশ্রয় দিয়ে তাকে সভ্যতার আসনে টেনে তোলা—এইসব স্মরণযোগ্য ঘটনার বাহুল্যই আঘাতের শীতলপ্রলেপ হিসাবে হয়তো থাকবে চিরকাল। যখনই দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াবার মুহূর্ত এসেছে তখনই তাঁর কাছে দৌড়ে গেছি। এবং ঈশ্বরপ্রেরিত বরাভয়ে সজ্জিত হয়েছি আমি, এরকম শ্রদ্ধাবনত অনেকেই। শুধু কী তাই। কিংবদন্তীস্বরূপ যেসব বাঙালীমণীষার কথা আমাদের যুগ শুনে থাকে তারই একটি সময়োপযোগী ডিকানটেশনে সৃষ্টি হয়েছিল যেন কমলকুমারের জীবন। তিনি ও তাঁর সৃষ্টির সংগে প্রতিটি সাক্ষাতেই একটি করে অভিজ্ঞতার স্বর্ণমুদ্রা জমা করেছে। রূপকথার পাখির মত ডানা বিছানো একটি মেরু যোগাযোগকারী ভ্রাতৃস্নেহ থেকে সরে গেলাম! এখন 'অনাথ' শব্দটি একান্তই নিজের মনে হয়।

চিঠিপত্র

বিষ্ণু দে-র চিঠি

কমল কুমার মজুমদারকে লিখিত চিঠিপত্র

১·

রিখিয়া, দেওঘর
৩০।১০।১৯৪৬

পরমপ্রীতিভাজনেষু,

আপনার ২৬ তারিখের চিঠি পেয়ে খুশি এবং কাজের বিবরণে খুশি বোধ করছি। দয়াময়ী সমভিব্যাহারে দুচারদিন কাটিয়ে গেলেন কৈ? বল্লেন আসবেন, গঞ্জিত করলেন।

নোটস্ লেখা চলছে জেনে উৎসুকতর বোধ করছি। অশোক সেন কি বলেন? দেখা হয়? তার আসবার কথা আছে, আপনাদের সঙ্গে!

দেশী ৩০ টাকা এখন আপনার কাছেই গচ্ছিত থাকুক। চতুরঙ্গের খবর কি?

আপনার শ্রীপদার্পণের আশায় দুদিন আপনার পৈতৃক হর্ম্য উহিরাবণঞ্চ (?) ঝুলাদি ঝাড়াপোছা করেছি, দুদিন স্বহস্তে চীরচ্ছদ যষ্টিসহযোগে শৌচগৃহপাত্র পরিষ্কার করেছি।

মুষিকভুক্তাবশেষ বইগুলি গতবছরে বিরিঞ্চিধামাৎ এসে ঝেড়েছি কিন্তু ডি ডি টি সত্ত্বেও এবারে আবার মুষিককুলের জুলুমের বিরুদ্ধে কর্মপন্থা ধরেছি। জঙ্গল সাফ ও সর্পনিধনও করেছি।

অধিক কি লিখব, দর্শনে বলব। বিষ্ণু দে

২.

1/10, Prince Golam Mohammad Road,
Calcutta-26
22nd. September, 1958

Dear Sir,

I have pleasure to inform you that Mr. Bishnu Dey has perused with great interest your fine story 'Tahader Katha and was duly impressed as he usually is by what you write. He desires me to convey his thanks to you and remains ever your humble servant.

Yours truly,
Jishnu Dey.

পোস্টকার্ড : টাইপ করা চিঠি
প্রাপক :

To
Kamal Kumar Majumder, Esq.,
38/46 S. K. Deb Road,
Calcutta-28
(Local)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চিঠি

৫। বি, ডাঃ শরৎ ব্যানার্জী রোড
১৮. ৪. ৫৯.

প্রীতিভাজনেষু,

কলকাতায় মে মাসে যুব উৎসব হচ্ছে। উৎসবের পাণ্ডারা এসে ধরেছে আপনার কাছ থেকে 'বাংলাদেশের উৎসব' সংক্রান্ত একটা ছোট প্রবন্ধ আদায় করে দেবার জন্য। ওরা আপনার সঙ্গে খুব শিগ্‌গির দেখা করবে বলেছে। আপনি লিখলে আমরা সবাই খুশী হবো, না বললেও চলে।

কবে আবার দেখা হবে? সেই লেখাটার কথা ভুলে যাননি তো? রমাকে জানাবেন। খবর পেলেই যথাস্থানে যথাসময়ে হাজির হবো। ভালবাসা জানবেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পোস্টকার্ড : প্রাপক : কমল মজুমদার। ৩৮/৪৬ এস কে. দেব রোড কলকাতা-২৮

নবনীতা দেবসেনের চিঠি

১০/৭/৭৫

শ্রীচরণেষু,

আমার প্রবন্ধ পড়ে আপনি যে রাগ করবেন না, আমার সে বিশ্বাস ছিল। আমার আন্তরিক প্রণাম গ্রহণ করবেন। আপনার ওপর আমার অভিমানের শেষ নেই। আপনার হাতে যে-কলম ঈশ্বর দিয়েছেন আমরা তার পূর্ণ স্বাদে কেন বঞ্চিত রইলুম—শুধু খেলাধুলো, রঙ্গরসিকতায় এমন অসামান্য শক্তি বয়ে চলে যাচ্ছে এ দেখতে আমার কষ্ট হয়। আপনার সঙ্গে তুলনীয় কবিত্বশক্তি, শব্দশক্তি, সহৃদয়তা নিয়ে বর্তমানে আর কোনো বাঙালী সাহিত্যিক জীবিত আছেন বলে আমার মনে হয় না। অথচ তার থেকে আমরা কতটুকু পেলুম।

বালভাষিত বলে আমার ঔদ্ধত্য মাপ করে নেবেন। আপনার কাছে এখনও অনেক আশা রাখি—

প্রণতা
নবনীতা

পু : আমার একটা পুরোনো বই আপনাকে দিচ্ছি, অবশ্য বইটা এখন আমার আর ভালো লাগে না। পিকোলোর বাবাকে লিখে দিয়েছি আপনার Rose Madder আর Ultramaine (দুর্বোধ্য)-এর আনবার জন্যে। ততদিন এই দিয়ে কি কাজ চলবে?

নির্দেশ :

পত্রে উল্লেখিত প্রবন্ধ : The Modish Traditionalizer : A Case-Study by Nabaneeta Dev Sen, Vagartha, No. 9, New Delhi, April 1975.

এই প্রবন্ধে কমলকুমার মজুমদারের সাহিত্য পদ্ধতির সমালোচনা করা হয়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠি

কৃত্তিবাস
১১, অক্রুর দত্ত লেন, কলিকাতা-১২
ফোন : ২৪-৩৮৪৭ : ৪৬৩০-২২

শ্রদ্ধেয় কমলদা,

সেই অনেকদিন আগে একদিন বাজারে দেখা হয়েছিল। আপনাকে দেখে সেদিন আমার কুচো মাছ কেনা হয় নি।

কিছু কি লিখছেন? একটি লেখা কি আমরা পেতে পারি? যে-কোনও দিন আজ্ঞা করলেই আপনার লেখা নিয়ে আসতে পারি। আপনার 'গোলাপ সুন্দরী' গল্পটির কোনো একটি কপিও কি এখন পাওয়া যায়? গল্পটা অনেকদিন পড়িনি, কোনও মৃত্যুর কথা শুনলেই গল্পটির কথা মনে পড়ে এবং পড়তে ইচ্ছে করে।

শরীর এখন মহাশয় নিশ্চয়ই?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রাপক: শ্রী কমল কুমার মজুমদার। ৫০, ডি হাজরা রোড, কলকাতা-১৯

[চিঠিটা তারিখহীন। ডাকছাপ থেকে বোঝা যায় এই চিঠি কমল কুমার মজুমদার পান ১৮।৭।৭০ তারিখে।]

কমলকুমার মজুমদার লিখিত চিঠি

(সুব্রত চক্রবর্তীকে)

6 12. 70
South Point H. School
82/7A, Ballygaunge Place
Calcutta—19

স্নেহের সুব্রত,

যেদিনকে এই নূতন বাড়ীতে আসিতেছি ঠিক তাহার আগের দিন অর্থাৎ ১লা / ১২ তোমার চিঠি পাইলাম। ঐ বাড়ীতে প্রায় ৮ বছর হয় ছিলাম, অনেকবারই সেখানে কাঁদিয়াছি, অনেকবার মৃদু হাসিয়াছিলাম। বাড়ীর দরজা জানলার প্রতি মেজের প্রতি আমার চাহিবার ক্ষমতা ছিল না। ইহারা বড় লক্ষ্মীবড় সুন্দর, মঙ্গলময় দেবতার ন্যায়,প্রত্যহ বাড়ী ফিরিয়া সদর-দরজায় দাঁড়াইতে পারার আশীর্ব্বাদ প্রত্যহ সদর দরজা করিয়াছে, কত রকম অবস্থাতে হায় ভাবিলে মহা এক বেদনায় হাসি পায়—মহামান্য অতিথির ন্যায় ইহা আমাকে সাদর সম্ভাষণে প্রবেশ অনুমতি দিয়াছে; নানাবিধভাবে এখানে ঘুমাইয়াছি—আমার বাবার মৃত্যুসংবাদ যখন টেলিফোনে আসিল—ইস্···সেদিন আমাকে ইহারা দুঃখ করিবার মত অমোঘ সৌন্দর্য্য দিয়াছে। ইহাদের মঙ্গলকামনা ভুলিবার নহে। বহু বাড়ী আমি বদলাইয়াছি—পাতিপুকুরের বাড়ীর জানলায় দাঁড়াইলে যে মেঘস্তর দেখা যাইত তদ্রূপ কখনও অন্যত্রে দেখি নাই; উত্তরের দরজা খোলা থাকিত—

সন্ধ্যায় বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠের অন্যধারে আরও উত্তরে, ছোট রেল চলিয়া যাইত। বহু বাড়ী আমি বদল করিয়াছি—ঠাকুরপুকুর, যাহা একেবারে দক্ষিণে হইতে কামারহাটি ইতিমধ্যে উত্তর কলিকাতায় আমার সুদীর্ঘ দুঃখের দিন কাটিয়াছে। ইদানীং যাহা অতীব সুখদা যে প্রতিটি ঘ্রাণেই ঠাকুরকে মাধবকে স্মরণ করিয়াছি। আমার মতন একাধারে মার্ব্বেল জীবন কেহই অতিবাহিত ও নির্বিঘ্নে অর্থাভাব কেহই ভোগ করিবে না। আমার মত কেহই সংযমী নহে কেহ দুর্দ্দান্ত লোভ সম্বরণ করে নাই উচ্চ পদ্ধতির খাওয়া যাক—বর্ষার প্রারম্ভে কেওড়া উঠিলে তাহার অম্বল চিংড়ী মাছ সহ! অথবা পচা সড়া নারকোলের পাটনাই লঙ্কা দ্বারা বড়া—বা! গিমে শাকের বড়া! পাকা পটল পোড়ার শুক্ত! দারুণ মোগলাই বা ফরাসী এগুলি কিছু নয়। একবার Jean Renoir-র সহিত আমি বাঙলার খাবারের গল্প করি, ব্যারাকপুরে যে বাড়ীতে তাহার Location—সেখানে তাহার সহিত আমি যাই। পশ্চিমে গঙ্গা সেখানে এক কলাকুঞ্জে একটি দারুণ মর্ত্তমানের মোচা ধরিয়াছে (বিভূতিভূষণ হইলে লিখিতেন অগ্নিশ্বর বা কালীবৌ কলাগাছ কেন না তিনি প্রকৃতিপ্রাণ)—মোচা খাওয়ার কথা হইল। মোচা কোটার আর্ট কি দারুণ! থোড় কোটার পদ্ধতি—তিনি অবাক! পরে তরকারী কোটার পদ্ধতি—(ধর ঝোলের আলু পটল যদি ডালনায় দেওয়া হয় তাহা হইলে কি মারাত্মক আমরা ক্ষেপিয়া যাই।) তখন রেনোয়াকে বলি, এক প্রসিদ্ধ কলা আছে যাহাকে ভয়েরা কলা বলে - ইহাতে বীচি খুব—তাহার ডালনা গোটা ফোড়ন দিয়া—আঃ! খাদ্য অভিমানী ফরাসী হাঁ হইয়া গিয়াছিলেন। ইহার পর পারফিউম—বিছানা - হামাদান কার্পেট - কত কিউরিও! সব দেখিয়া আমি চিমটা বাজাইয়া হাসিয়াছি—কি মায়ার খেলা! চৌখস বুদ্ধি মানুষের এই যে উহা মানুষকে নিজেকে নিজে বোকা বলিতে সহায়ক হইয়াছে, পেছপাও হয় না। এখন নহে, আমার ছোট বয়সে যখন আমি ন্যাড়া হইয়া ভগবৎ সাধনা করিতাম—আমার স্বপ্নে যখন মহাপ্রভু ঠাকুর শ্রী অরবিন্দ—ইহার হাতে লণ্ঠন দেখি—পীরসাহেব—শ্রীশ্রী আদ্যাশক্তিরূপিনী মা—এবং আশ্চর্য্য গঙ্গা তাঁহার লীলা কলেবরে প্রবাহমাণতায় দর্শন দিয়াছেন—প্রায় হপ্তায় মাধব আমাকে ছাড়েন নাই। মায়া শব্দটি আমিই বলিতে পারি। আমি তাহাদের ছাড়া নহি! আমার ambition নাহি অহঙ্কার নাই—আবার একদিক দিয়া কিছু আছে—উহা ঠাকুর বলেন—কাজলের ঘরে থাকিলে কালি লাগিবেই। একটি জিনিষই আমি জানি তাহা ভগবানকে ডাকা! আমার মস্তিষ্ক সন্ন্যাসধর্ম্মে পরিপুষ্ট সঠিক

বাঙ্গালী। আমি যদি autobiographic (?) লিখি তাহা হইলে তাহাতে বাঙালিত্বের কম্পন তাহাতে বহিবে। আমাকে মল্লারপুর ষ্টেশনে দেখ।—তখন মধ্যরাত, আমি যে কামরায় সেই কামরায় যেমটি আমোদ ছিল তাহার মত দুর্দ্দমনীয় রূপ, চেহারা কখনও চোখে পড়ে নাই—তাহার জোড়া ভুরু- পিঙ্গল দীঘল (সত্যেন দত্ত অনুপ্রাস) গঞ্জিকারক্ত নয়ন—এবং পাঠান বাহুদ্বয় যাহার একটিতে আড়াই প্যাঁচ, যাহা আজানুলম্বিত—"নাক ছোট চোখ ভাসা তারে বলে মুখ খাসা॥" দন্তপাতিতে যেন রাজহাঁস খেলিতে আছে এত আলো! অথচ সে পান খায়— মাঝে মাঝে নিকেলের টিনিং করা আদতে কৌটা হইতে বেদানা খিলি পান খাইতেছিল। তাহার চাহনিতে পৃথিবী নড়িতেছে! সে বুঝিয়াছিল আমি তাহারে দেখিয়া কোথাও কম্পিত ইঁদুর। আমি একচাকা যাইব নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বাড়ী মল্লারপুর হইয়া যাইতে হয়—সে সাঁইথিয়াতে চড়িল—সে দুবরাজপুরের কালী দর্শন করিয়া হাঁটাপথে বক্রেশ্বর যায়, সে প্রথম কামরায় উঠিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল, 'চেনা মানুষকে চিনতে পারলাম গো! হায় হায়!' কেন সে ঐ তীর্থে যায় সে কাহিনী শরৎবাবুর—বঙ্কিমবাবু প্রথম শিক্ষিত বাঙালীকে জানাইলেন যে রমণী দ্বারা বংশরক্ষা হয় সত্য কিন্তু সে ভালবাসে—যিনি আরও পরিষ্কার ভাবে তাহা ব্যক্ত করিলেন (সঞ্জীববাবু যে touch দিয়াছেন সে আর এক তিনি সর্ব্বদাই অনুতপ্ত! ইস্ সঞ্জীববাবু great master)—যখন আমরা দুজনেই মল্লারপুরে নামিলাম; সে নামিতেই লাইনসম্যান (!) নানাবিধ অর্দ্ধতন কর্ম্মী তাহাকে, ছোটলোকরা ঘিরিল—কি লো ভাব্‌বের ভাবি আমোদিনী, কপালে তিলক বটে কিসের—লে লে তিভুবন খাগী এবার জগৎ উদ্ধার কঁরহ বটে! ইহাতে আমি এখন বিশেষ আহত আমার মরমে লাগিল—বুঝিলাম আমি আমোদের টানে পড়িয়াছি—তখন বয়সই বা আমার কত! আমি হন্ হন্ করিয়া ফাষ্টক্লাস waiting রুমের দিকে যাই (III টিকিট আমার অবশ্য!) আমি শুইবার উপক্রম করিতেছি, কুলি আলো দিয়াছে, এমন সময় দরজায় আমোদ তাহার পশ্চাতে ট্রেন সরিতেছে—আঃ সে দরজায়, যে দরজায় লোকে অপেক্ষা করে—কহিল—বাবু গো আমার কথা শুন বটে আমি নঠো (নষ্ট) বটেক—তবে বলি তোমার মধ্যে হে (মধ্যে) সিদ্ধাই আসছে বটে" বলিতে সে কম্পিত, বলিতে সে ঘোরে, তাহার ওষ্ঠদ্বয় অজস্র চুম্বনে যাহা অনেক কুৎসিত গীতে যাহা ফুলিয়াছে তাহা সুন্দর হইল পাতলা হইল। তাহার কণ্ঠে বিশুষ্ক ফুলমালা, দুলিতে আছে- (সে যে নষ্ট ইহার জন্য সে কাতর নহে—সে

অনেকবার কামরায় বাহুদ্বয় আন্দোলিয়া খোপায় ঠিক দিয়াছে—তাহার বাঁকা চাহনি!) ইহার পর নিঃসঙ্গ পথ ছাড়াইতে হাতড়াইতে ছিলাম! আমোদ তখনও ঐখানে—তাহার চোখ কলিকাতাস্থ মেয়েদের মত নহে, পদ্মার ইলিসের তুল্য—হাত নিকটে লইলে চক্ষু তখনও স্তম্ভিত—যাহারা রমণীত্বের জন্য হা হা করে নিম্ন-উদর উল্লেখিয়া কাপড় পরে! আমরা যেন রমণী কি ভুলিয়াছি! আমোদ femme fatal ফাম ফাতাল—আঃ ফাম ফাতালে (র) বাঙলা করা যায় না, উচিতও নয়। ট্রেন সরিল—ফাঁকা উহার পশ্চাদ দিক! ট্রেন বা আকাশে তাহার কোন তারতম্য নাহি! তাহারে আর দেখি নাই যদিও সে বলিয়াছিল কোথায় সে থাকে! ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে আমি চলিলাম মধ্যে নির্জ্জন রাস্তায় তখন সূর্য্য লাল—সন্ন্যাসিনীকে দেখিলাম, ইনি কে আমাকে বলিতে হয় নাই—আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি! সত্যই আমি কি মহৎ—আমি আমার বিশ্রী কাম কুৎসিত ক্রোধ ইত্যাদি লইয়াই বড় সুন্দর! আমি এখনও নিত্য তাহারে স্মরণ করি যখন কিছু জাগতিক নিয়মে ভাল ঘটে—মন্দতে নহে। ইনি আমাকে মন্ত্র দেন নাই দর্শন দিয়াছেন, মৃদু হাসিয়াছিলেন! এইটুকু যথেষ্ট! তুমি জান আমি বড়ই নিঃসঙ্গ! আমার আত্মীয় বন্ধু স্বজন কেহ আজ বহুকাল হয় নাই।……। আমি খুব একা। একদিক দিয়া আমি তাহা নই—কেন না অহরহ তাঁহারা আমার সহিত। এ সত্য তাহারা জানেন, দুআনা পয়সা ধার করিতে চার মাইল হাঁটায় বা কোন দিন ট্যাপিওকা সিড (যাহাকে সাবু বলিয়া মানে ঐ রূপে বিক্রি হয়) ও ডালের খিচুড়ী খাইতে বা রোগে বা হাজত বাসে কোনদিন তাঁহাকে ডাকি নাই, কেন না আমার সহিত তাহারাও ভুগিয়াছেন। তাঁহাদের জন্য আমার বড় কষ্ট হয়। অতএব আমি একা কখনই নই।

তুমি আমার লেখার কথা লিখিয়াছ—তাহা অসম্ভব নহে, প্রথমত আমাদের গল্প উত্তরপ্রধান, কখন প্রশ্ন পরোক্ষে—কখনও প্রত্যক্ষ! ফলে উত্তর, উত্তর হইলেই dialogue হয়, এ ব্যপারে দিদ্‌রো সিদ্ধ, এ ব্যাপারে সঞ্জীববাবু বড় নিদারুণ! অনেক সময়তে আমরা পাঠকের সহিত বাক্যালাপ করি। অনেক বর্ণনা ধর্ম্ম লেখাতে থাকে তবে আমি যাহা চাই সেইটা আর এক তাহা পাচার করা—মর্ম্মভেদ—এখানে অবশ্য একটা myth সৃষ্টি হয়; অনেক সহৃদয় পাঠক বলেন আমাতে symbol থাকে—কিন্তু আমি ইহা মানিয়াও মানি না, আদতে না মানিয়া মানি—অরূপরতন ঐ কথা লেখে। intuitive evidence (চালাকি নহে) বলিতে যাহা বুঝায় তাহারই একমাত্র দিক—আমি তাহাতে

যাইতে চাহি? এখানে সংলাপ ধর্ম্ম বজায় থাকে না আবার থাকিয়া যায়। যাহা হউক ইহার প্রমাণ প্রয়োজন (!) দেখি কি হয়। বৈদিক সত্য একেবারে intuition! symbol এর মধ্যে দেখার সত্য অর্থ বাধ্যবাধকতা থাকে কিন্তু উহাতে অনুভবের, এই অনুভব বড় পাঠান ব্যাপার। নির্জ্জনা রৌদ্রে ইহার বাসস্থান, ঠাকুর বলেন 'কথা ইসারা বটে' ইসারায় দিক আত্মিকা সর্ব্বব্যাপিনী সত্য আছে—দিক আত্মিকা অর্থ কোন না কোন জড়ত্ব, স্থবির, চতুর বিংশতিতত্ত্ব কিছু না কিছু—ইহা সুতরাং symbol মনে হওয়া স্বাভাবিক—কিন্তু আমি বা আমরা যেমন পাচার করিব তেমনই পাঠকও তাহার দায়িত্ব তেমনই উহা পাচার করিবে—আমাদের লেখা তাহাকে উহা হাতে ধরিয়া শিখাইতে হইবে। 'চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরান সহিত মোর। এখানে ছবি আছে বস্তুগত জগত ছাড়াইয়া পাঠক তখন চির অভিসারিণী লহরী তত্ত্ব রাধিকাকে অনুভব করিবে। তবে আমরা কি করি তাহা আমরা জানি না—যিনি তোমাকে আমাকে সবাইকে দিয়া লেখান তিনি সেই রহস্য জানেন আমাদের জানার প্রয়োজন দেখি না। ব্যবহারিক জীবনে আমার দরজা বন্ধ করা—বন্ধ হইল কিনা দেখা—শিকল দেওয়া ছিটকানি তোলার বাতিক আছে (যাহা সন্ন্যাসীদের করা উচিত নহে—সন্ন্যাসীরা গ্রন্থিকে স্ত্রীলোকের মত ভয় করে) সেই জন্যই যে সব বলিলাম না তাহা নহে—সত্যই আমি জানি না। তোমার চিঠি আমি ঐ আধ-ফাঁকা বাড়ীতে বসিয়া অনেকবার পড়িয়াছিলাম—চারিদিকে অনেক বন্ধন যাহাতে বহমানতা নাই আপাতভাবে যে গুলিকে বহন করা হইবে ফলে উহাতে বহমানতা আসে। ডারউইন Beagle যাত্রা বইতে বলিয়াছেন মানুষ বহু নূতন পতঙ্গ এক এক দ্বীপে বহন করিয়া লইয়া যায় (যেমন বর্দ্ধমানের মহারাজা দার্জিলিঙে কাকা লইয়া যান—গড্ডলিকা দেখিও) আমিও এখানকার অনেক কিছু লইয়া যাইব। এই বাড়ী ছাড়ার প্রথম কারণ আমাদের বসিবার ঘরের ঠিক পশ্চিমে যে ছোট মাঠ তাহাতে এক garage খোলা হইয়াছে march মাস হইতে, এখানে মাঝেমধ্যে বিশেষত গত বৈশাখে কয়েকটা ডিজেল গাড়ী পরপর সারানো হয়, তাহার ধোঁয়াতে আমার হাঁপানি প্রবল হইল—আমি প্রায় পাগলের ন্যায় বাড়ী খুঁজিতে লাগিলাম। এখানে ভাড়া ছিল ১৯০ টাকা। এখানে এই নূতন বাড়ী ২৫০ টাকা বাড়ীটি চমৎকার—স্কুলের খুবই নিকট। ঐ অঞ্চলে যথেষ্ট গোলমাল, সকালবেলা উঠিয়াই রিভলভার দেখার মত ঘৃণ্য ব্যাপার কিছু নাই। আমি রায়েটে (Riot) ১৭ই আগষ্ট হইতে বহু মারাত্মক ব্যাপার দেখি—১৮ই

হইতে বহু রিলিফ করি। কত যে ভয়ঙ্কর দুর্যোগের মধ্যে সেদিন হইতে ঐ ২০ তারিখের মধ্যে গিয়াছি তাহা ভাবা যায় না—ঠাকুর ছিলেন! যতদূর মনে পড়ে ২১ তারিখ হইতে প্রবল বারিপাতে ঠাণ্ডা হয়—সারাদিন পথে পথে আলো নিভানো হয় নাই—কাকপক্ষী নাই কুকুররা যে কোথায় কেহ জানে না সে এক বীভৎস ব্যাপার। তবু তাহা বুঝি যে ইংরাজ বাঙ্কংরা তাহা ঘটাইল আর পশুরা তাহা শুনিল। কিন্তু ইদানীং বেলেঘাটা যে কি কুৎসিত তাহা ভাবা দুষ্কর! আমার স্ত্রীকে বাজারে এক ভদ্রমহিলা বলিয়াছিলেন—পুলিশ মারছে ঠিক করছে। কিছু রক্ত ত যাবেই। এরূপ জগমনি (প্রফুল্ল) কি কখন ভাবিতে পার! ইহা ব্যতীত নিত্য বাস বন্ধ—কাঁহাতক ট্যাক্সী চাপা যায়। এমনি তে তুমি জান আমি কি দরিদ্র। সব থেকে দোষ আমি কাহারও তেল দিতে পারি না। তাই এই হাল। (একমাত্র শিশুদের আমি খুব flattery করিয়া থাকি) অবস্থা শোচনীয়—ইন্দ্রনাথ যদি না থাকিত মানে আমার সহিত জানাশুনা না হইত। তাহা হইলে কবে উড়িয়া যাইতাম। ঠাকুরই সব করান।

ঠাকুর করুণ তুমি মঙ্গলে থাক

ইতি

কমল কুমার মজুমদার

৬-১২-৭০

এই চিঠি কমলদা লেখেন ৫০ ডি হাজরা রোড, কলকাতা-১৯ থেকে। ঐ বাড়ির তিন তলার ফ্ল্যাটে তাঁর জীবনের শেষ ৮ বছর কেটেছে। এর ঠিক আগে, বেলেঘাটায় যে বাড়িতে থাকতেন। তার ঠিকানা হল: ১৫৭।১, নিউ সি, আই, টি, রোড, কলকাতা-১০।

ইনল্যাণ্ড লেটার কার্ডে লেখা এই দীর্ঘ চিঠি হস্তলিপির সৌন্দর্যও অসাধারণ—কপি করতে আমার ফুলস্ক্যেপে ৫ পৃষ্ঠারও কিছু বেশি লাগলো। আমরা জানি, কমলদা পুরোনো রীতির বানানের পক্ষপাতী ছিলেন—এখানে কম বেশি, তা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। কিছু বানান ভুল ও লেখার চ্যুতি সহ চিঠিটা হুবহু কপি করেছি—শুধু, বিশেষ কারণ বশতঃ, একটি বাক্য এড়িয়ে গেলাম।

চিঠিতে উল্লেখিত অরূপরতন হলেন অরূপরতন বসু। ইন্দ্রনাথ—ইন্দ্রনাথ মজুমদার।

চিঠিতে একটি তথ্যগত ভুল আছে। একচাকায় নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর নয়, অদ্বৈত মহাপ্রভুর বাড়ী। পরের চিঠিতে, ৬-১-৭১-এ লিখিত, কমলদা এই

ভুলের সংশোধন করে দিয়েছিলেন 'দেখ একচাকা নিত্যানন্দ মহাপ্রভু নহে অদ্বৈত মহাপ্রভুর বাড়ী—নিশ্চয় ভুল লিখিয়াছি।'—সুব্রত চক্রবর্তী।

কমল কুমার মজুমদারের রচনা এবং অন্যান্য

গ্রন্থ

১. অন্তর্জলী যাত্রা। উপন্যাস। ১৩৬৯
২. নিম অন্নপূর্ণা। গল্প সংকলন। ১২৭০
৩ গল্প সংগ্রহ। ১৩৭৯
৪. দানসা ফকির। নাটক। ১৩৮২
৫. খেলার প্রতিভা। উপন্যাস। ১৩৮৪
৬. পিঞ্জরে বসিয়া শুক। উপন্যাস। ১৩৮৫

সংকলন

ঈশ্বর কোটির রঙ্গ কৌতুক। ১৩৮৪

সংকলন ও চিত্রণ

১. আই কম বাইকম। ছড়া। ড্রয়িং। ১৩৭০
২. পানকৌড়ি। ছড়া। উড্‌কাট। ১৩৭২
৩. ঈশ্বর গুপ্তের ছড়া ও ছবি। উড্‌কাট। ?

অগ্রন্থিত রচনা

১. রীতির রহস্য। প্রবন্ধ। চতুরঙ্গ, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৬ পুনর্মুদ্রণ: আবহ শারদীয়, ১৩৭৯
২. গোলাপ সুন্দরী। গল্প। এক্ষণ, এপ্রিল-মে ১৯৬১ পুনর্মুদ্রণ: কৃত্তিবাস, মাঘ ১৩৮২
৩. কঙ্কাল এলাইজি। গল্প (অসম্পূর্ণ)। এক্ষণ, ডিসেম্বর-জানুয়ারি ১৯৬১-১৯৬২
৪. অনিলা স্মরণে। উপন্যাস। দর্পণ, শারদীয় ১৩৭১
৫. শ্যাম-নৌকা। গল্প। এক্ষণ, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৩৭১
৬. লীলাবতী। গণিত তত্ত্বের অনুবাদ। অঙ্কভাবনা, জানুয়ারি ১৯৬৫
৭. সুহাসিনীর পমেটম। উপন্যাস। কৃত্তিবাস। শারদীয় ১৯৬৫

৮. কঙ্কালের টঙ্কার। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে পালা। অন্বীক্ষণ, শারদীয় ১৩৭৫
৯. পরিপ্রেক্ষিত। নিবন্ধ। দর্পণ, ৬ মে ১৯৬৬ পুনর্মুদ্রন : উলুখড়, আশ্বিন ১৩৮৩
১০. অভিনয় ও কিংবদন্তী। প্রবন্ধ। ফিল্ম, ১৯৬৬
১১. বঙ্গীয় শিল্পধারা। প্রবন্ধ। এক্ষণ, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭৪। পুনর্মুদ্রণ পরিক্রমা : পঃ বঃ প্রদেশ কংগ্রেস স্মারক পত্রিকা ১৯৭২
১২. বাংলার টেরাকোটা। প্রবন্ধ। উত্তরকাল, আষাঢ় ১৩৭৬
১৩. নাতুরালিসম। প্রবন্ধ। নিষাদ, অক্টোবর ১৯৭০। পুনর্মুদ্রণ: বিজ্ঞাপন, কার্তিক, ১৩৮৩
১৪. চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার। প্রবন্ধ। চলচ্চিত্র, প্রথম পর্যায়, সিগনেট প্রেস। পুনর্মুদ্রণ: পঞ্চতন্ত্র, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
১৫. 'কথা ইসারা বটে' ভগবান রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন। প্রবন্ধ। সমতট প্রকাশন, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৭২
১৬. মার্শেল প্রুস্ত বিষয়ে কিছু। প্রবন্ধ। পদক্ষেপ, শারদীয় ১৩৭৮
১৭. পূর্ববঙ্গ সংগ্রাম বিষয়ে। প্রবন্ধ। দর্পণ, ৭—১৪ মে, ১৯৭১
১৮. ফাৎনা মনস্কতা। প্রবন্ধ। কৃত্তিবাস, জুন ১৯৭২
১৯. শ্যাম-নৌকা (নতুন অংশ)। গল্প কবিতা, শারদীয় ১৩৭৮
২০. বঙ্গীয় গ্রন্থচিত্রণ। সচিত্র প্রবন্ধ। এক্ষণ, ৪-৫ সংখ্যা, ১৩৭৯
২১ অজ্ঞাতনামার নিবাস। গল্প। আবহ, শারদীয় ১৩৮০
২২. সাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদারের সঙ্গে কথাবার্তা। সাক্ষাৎকার। সমতট প্রকাশন ২১-২২। ১৯৭২
২৩. ইদানীন্তন শিক্ষা প্রসঙ্গ। প্রবন্ধ। কালি ও কলম, আশ্বিন ১৩৮০
২৪. রেখো মা দাসেরে মনে। বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে প্রবন্ধ। কৃত্তিবাস, জানুয়ারি-জুন ১৯৭৪
২৫. দ্বাদশ মৃত্তিকা। গল্প। এক্ষণ, শারদীয় ১৩৮১
২৬. স্বাতি নক্ষত্রে জল। গল্প। কালি ও কলম, আশ্বিন ১৩৮১
২৭. অনিত্যের দায়ভাগ। গল্প। আবর্ত, আশ্বিন ১৩৮১
২৮. ভাবপ্রকাশ বিষয়ে। প্রবন্ধ। শব্দ, মে-জুন ১৯৭৫
২৯. নির্বাচিত গ্রন্থ। ?। কস্তুরী, এপ্রিল ১৯৭৫

৩০. আর চোখে জাগে। গল্প। অমলতাস, বৈশাখ ১৩৮২ এবং এক্ষণ, শারদীয় ১৩৮৪

৩১. বাগান লেখা। গল্প। জর্নাল সত্তর, সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

৩২. লেখা বিষয়ক। 'বাগান লেখা' সম্পর্কে আলোচনা। জর্নাল সত্তর, ৫ম সংখ্যা, ১৯৭৬

৩৩. কলকাতার গঙ্গা। প্রবন্ধ। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০.১১.৭৬

৩৪. শরৎবাবু ও ব্রাহ্মণ্য। প্রবন্ধ। আঁড়ু, ১৩৮২

৩৫. শরৎবাবু ও ব্রাহ্মণ্য। প্রবন্ধ। গাঙ্গেয়পত্র, আশ্বিন ১৩৮২

৩৬. শরৎবাবু বিষয়ক নোট। সত্তর দশক। এপ্রিল-জুন ১৯৭৭

৩৭. সীতেশ রায়ের ছবিতে বাঙালী ধরন দেখা যায়। শিল্পীর চিত্র প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক পত্রিকা। জুলাই ১৯৭৭

৩৮. খেলার দৃশ্যাবলী। গল্প। গাঙ্গেয়পত্র, চৈত্র ১৩৮২

৩৯ প্রতীক জিজ্ঞাসা। প্রবন্ধ। শব্দ : প্রতীক সংখ্যা ১৩৮৩

৪০. বাগান দৈববাণী। গল্প। গোলকধাঁধা, গ্রীষ্ম ১৩৮৩ ও গ্রীষ্ম ১৩৮৪

৪১. ছাপাখানা আমাদের বাস্তবতা। শ্রীপান্থের 'যখন ছাপাখানা এলো'র সমালোচনা। প্রবন্ধ। দেশ ১৯ ৮.৭৮

৪২. খেলার বিচার। গল্প। কৌরব, শারদীয় ১৩৮৫

৪৩. খেলার আরম্ভ। গল্প। এক্ষণ, শারদীয় ১৩৮৫

৪৪. বাগান কেরারি। গল্প। বারোমাস, শারদীয় ১৩৮৫

৪৫. বাগান পরিধি। গল্প। শিরোণাম, শারদীয় ১৩৮৫

৪৬. গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম। প্রবন্ধ। সংস্কৃতি পরিক্রমা, আশ্বিন ১৩৮৫

৪৭. সাক্ষাৎ ভগবৎ দর্শন। প্রবন্ধ। বিভাব, শরৎ ১৩৮৫

গ্রন্থ সমালোচনা

১। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠান'। চতুরঙ্গ। মাঘ ১৩৬৪

২। বিমল করের 'দেওয়াল' (১ম ও ২য় খণ্ড)। চতুরঙ্গ। বৈশাখ ১৩৬৫

৩। সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত 'পরম রমণীয়। চতুরঙ্গ। ?

ব্যক্তিগত পত্র

১। নিষাদ—৪র্থ সংকলন, জুলাই ১৯৭১

২। কবিপত্র—২৪শ সংকলন, ১৯৭২

৩। জর্নাল সত্তর—৫ম সংখ্যা, ১৯৭৬

৪। সংস্কৃতি সংসদ : শারদোৎসব স্মারক পত্রিকা, ১-১০-৭৭

চিত্র

সন্ন্যাসী। এক্ষণ। মার্চ-এপ্রিল ১৯৬৭

গ্রন্থ চিত্রণ

সতীকান্ত গুহের 'লাল কমল নীল কমল' ১৩৭৪

প্রচ্ছদ

নিজের সবগুলি বই ও সংকলন। তৎসহ—

১। কৃত্তিবাস ২২ নং সংকলন ১৯৬৫

২। কৃত্তিবাস ২৫ নং সংকলন ১৯৬৮

৩। পঞ্চতন্ত্র ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা (?)

৪। শুভ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ 'প্রতিদিন প্রতিরাত্রিবেলা'১৩৮৪

৫। ভাস্কর চক্রবর্তীর গদ্যগ্রন্থ 'প্রিয় সুব্রত' ১৯৭৮

৬। সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত কাব্যসংকলন 'প্রেমিক সন্ন্যাসী'

৭। কৌরব, শারদীয় ১৩৮৫

সম্পাদনা

১। তদন্ত : ডিটেকটিভ সাপ্তাহিক ১৯৫২

২। অঙ্কভাবনা : গণিততত্ত্ব বিষয়ক ত্রৈমাসিক ১৯৬৫ (২টি সংখ্যা)

আর, আনন্দবাজার, দেশ, দর্পণ ও সুন্দরম পত্রিকায় নানা সময়ে লিখেছেন চিত্র-সমালোচনা, নানা বিচিত্র বিষয়ে, লিখেছেন রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে যেমন 'বাঘ এবং জনসেবকে'। জনসেবকে লেখাগুলি 'রোজনামা' নামে—কয়েক সপ্তাহ বেরিয়েছিল –প্রতি রোববার। শরৎচন্দ্রের ইনটারভিউ নিয়েছিলেন কমল কুমার মজুমদার, প্রকাশিত হয়েছিল 'উফী'এ (১৩৪৪)। 'উফীষ' বেরোতো রিখিয়া থেকে। ঐ 'ইনটারভিউ'র সূত্রেই, লেখার জগতে কমলকুমার মজুমদারের আবির্ভাব। এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়।

কমলকুমার মজুমদারের আরও লেখা ও অন্যান্য কাজের (প্রকাশিত) হদিশ কেউ যদি জানান, কৃতজ্ঞ হবো।

সুব্রত চক্রবর্তী
ইছলামাবাদ, বর্ধমান—৩।

স্মৃতি, শূকরনন্দিনী, কথা বলো

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

দীপেন সম্পর্কে কেন, কারো বা কোনো-কিছু ব্যাপারে, এমন কি নিজের সম্পর্কেও আমার কোনো ওরিজিনাল স্মৃতি নেই। আমি বড় চেটেপুটে খেয়ে গেছি, বোঝা যায়। আমাকে ঘিরে তাই, আজ, উচ্ছিষ্টলোভী কাকের একবারো কা-কা নেই। আমার বাবা দুই-তিন বা চার বছর আগে মারা গেছেন। কত সাল? আমার মনে নেই। এবং এর সঙ্গে কামু-উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রথম পংক্তির কোনো রেজম্যা-সম্পর্ক নেই। হরিধ্বনি দিতে দিতে রাস্তার পর রাস্তা ধরে শবানুদৌড়ের সঙ্গে 'উঃ' 'আঃ', পায়ে ফোস্কা……গলানো পিচের সঙ্গে সেদিনের গ্রীষ্ম-দুপুর চৈত্র না বৈশাখ, কী মেশাচ্ছিল তাতে কী এসে যায়।

কাক না ভাবলেও স্মৃতিকে মাঝে মাঝে শূকরী ভাবি। স্মৃতির রঙে যে লাল, সেটা ছানা শূকরের মুখশ্রী থেকেও এসে থাকতে পারে, যা অন্তত প্রথম সাতদিন ভোরের পদ্মফুলের মত লাগে। আমার এমন কোনো শূকরী নেই, গলায় চেন বেঁধে আমার বাবু-বিস্মৃতি যাকে নিয়ে, লোহার গেটের সঙ্গে সশব্দে ঘুরে, পার্কে প্রবেশ করেনি। পার্কে কুয়াশা।

একটা বিমূর্ত মূর্তি তবু, দীপেনের ভাবনা এলে, ক্বচিৎ টায়ে টায়ে ফোটে : একজন শাপগ্রস্ত মানব-সিসিফাস। দেবতা সিসিফাস অভিশপ্ত হয়েছিল পৃথিবীটা তার ভালো লেগে গিয়েছিল—এই অপরাধে। সকলেই জানেন, তার ওপর অভিশাপ ছিল পর্বতচূড়ায় তাকে একটি ভারি পাহাড়খণ্ড ঠেলে তুলতে হবে; আর শীর্ষ ছুঁলেই পাথরটি যাবে গড়গড়িয়ে পড়ে। সে যতবার তুলবে ততবার পড়ে যাবে, সে ততবার তুলবে। সে তুলতে থাকবে। পাথর পড়ে যেতে থাকবে।

অভিশাপের দ্বিতীয়-অর্ধটি দীপেন্দ্রনাথ সম্পর্কে পুরোপুরি প্রযোজ্য বলে মনে হয়।

অর্থাৎ কিনা, প্রস্তরখণ্ডটি বারবার ঠেলে তুলতে যখন সে নীচের দিকে আবার নেমে আসছে।

সে তার অপরাধ জানে। সে অপরাধ কবুলও করেছে। পাথর কুড়োতে গিরিপথ ধরে সে ঐ নেমে আসছে।

সে কি দৌড়ে নামছে, অতি আগ্রহভরে? মনে তো হয়, না! তার পদক্ষেপ যার-পর-নেই সংযত, আর এটাই তো স্বাভাবিক। কেননা, সে জানে, ঐ পাথর চূড়া-সংলগ্ন করা তার সাধ্যাতীত, সে জানে। অভিশাপটি তাকে পুরোপুরি জানানো হয়েছে। সে জ্ঞানত নামছে।

দীপেনের প্রথমার্ধ সিসিফাস মূর্তিটি আমার কাছে আদৌ গুরুত্ব পায় না। তথাকথিত সাহিত্যিক দীপেন, তথাকথিত সম্পাদক দীপেন, তথাকথিত কমরেড দীপেন—বাবা দীপেন, ভ্রাতা দীপেন, সখা দীপেন কি স্বামী দীপেন—এরা সব। সেই একটাই পাথর কতবার যে এই মানব সিসিফাস ঠেলে ঠেলে ঘর্মাক্ত তুলেছিল! তখন তার পেশী শক্ত, চোয়ালে চোয়াল…তার মাথার ঘাম ঝরে পড়েছে তারই শক্ত পায়ের পাতায়। তখন সে সচেতনতা-বর্জিত!

এক ভিজে মৈশে-পড়া দেওয়ালে, বরং দ্বিতীয়ার্ধের মূর্তিটিই বারবার ফুটে উঠতে চায়। অস্থিমাংসরক্তমিশ্রিত হয়ে ক্বচিৎ টায়ে টায়ে ফুটে ওঠেও। তখন অভিশাপ-চেতনা তার গর্দানে রেখেছে ইয়েতির হাত, হৃৎস্পন্দন একটাও বেশি না, বুকে ঠেকেছে শ্মশ্রুময় চিবুক—ঘাম নয়—এখন তার পা-পাথরে ঝরে পড়ছে শব্দবিহীন অন্ত-আলোক।

গুল্মময় গিরিপথ ধরে পদক্ষেপ গুণে সে নেমে আসছে।

হুড়ি খসে পড়ছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

পর্ষদের কয়েকটি গ্রন্থ

ন্যায় পরিচয় / ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। ১১·০০
মৌলিক কৃষিবিজ্ঞান / শ্রীরলাইলাল জানা। ১৪·০০
সাইটোলজি / শ্রীমতী স্মৃহিতা গুহ। ১৮·০০
শিল্প ও শিল্পী / শ্রীকৃষ্ণলাল দাস। ৩৪·০০
ভৌত রসায়ন / ডঃ নিত্যানন্দ কুণ্ডু। ২২·০০
সমাজ বিজ্ঞানীয় ভূগোল / শ্রীবিমলেন্দু ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী অণিমা ভট্টাচার্য ২৫·০০
প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস / ডঃ রেবতীমোহন লাহিড়ী। ২৭·০০
তাপগতিতত্ত্ব / শ্রীঅশোককুমার ঘোষ। ২৪·০০
পদার্থ বিজ্ঞানের পরিভাষা / ডঃ দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। ১০·০০
আলোকের সমবর্তন / শ্রীস্মহাস রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২·০০
রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি (২য় সংস্করণ) / ডঃ সুনীল রায়চৌধুরী। ১৬·০০
সমাজতত্ত্ব (২য় সংস্করণ) / শ্রীপরিমলভূষণ কর। ১৫·০০
ভারতের শাসনব্যবস্থা / শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য। ২০·০০
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক / ডঃ গৌরীপদ ভট্টাচার্য। ১৮·০০
গণরাজ্য (প্লেটোজ রিপাব্লিক) / শ্রীসুধাকান্ত দে। ১৪·০০
এ্যারিষ্টটলের পলিটিক্স / শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার। ১৪·০০
বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্থা / শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষাল। ১৫·০০
পরিপাক, বিপাক ও পুষ্টি / শ্রীদেবজ্যোতি দাশ। ৩০·০০
খাদ্য ও পথ্য / ডঃ সমর রায়চৌধুরী। ১৫·০০
সংখ্যাতত্ত্ব / ডঃ রাজকুমার সেন। ২১·০০
কোষতত্ত্ব ও জীনতত্ত্ব / শ্রীঅমিয় কুমার চট্টোপাধ্যায়। ১০·০০
ভ্রূণ বিদ্যা / ডঃ কমলকুমার দাস। ৯·০০
প্রাণীদের শ্রেণীবিন্যাস ও পরিবেশ বিজ্ঞান / শ্রীসীমানন্দ অধিকারী। ৭·০০
হেল্‌মিনথিস্ এনিলিডা মলাস্কা / শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায়। ১৪·০০
অ্যামফিবিয়া ও রেপটিলিয়া / শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র। ১৬·০০

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার (নবম তল) কলিকাতা—৭০০ ০১২।

প্রবন্ধ

উর্বশীর হাসি

শঙ্খ ঘোষ

ধরা যাক, হাতের সামনে হঠাৎ আমরা পেয়ে গেলাম প্রস্তুত এক তালিকা, যেখানে সাজানো থাকবে রবীন্দ্ররচনায় ব্যবহৃত যাবতীয় ব্যক্তি আর বিষয়ের নাম, পুঁথি বা চরিত্রের প্রসঙ্গ। কতই-না সুখের হতো তাহলে! উৎসুক একজন জানতে চাইলেন সেদিন, রবীন্দ্রনাথ কি কোথাও বলেছেন ফ্লবেয়্যার বা চেকভের কথা? ধরা যাক, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজবার জন্য গোটা রচনাবলীর উথালপাথাল আলোড়নের আর দরকার হবে না কোনো, বর্ণানুক্রমিক সেই তালিকায় সহজেই খুঁজে নিতে পারব সেটি, না অথবা হ্যাঁ দুয়েরই নির্দেশ মিলবে দ্রুত। ধরা যাক এ-রকম কোনো তালিকায় চরিত্রনাম হিসেবে বজ্রসেন বা উপগুপ্ত থেকে শুরু করে উর্বশী মেনকা রম্ভাদেরও দেখা পাওয়া গেল কোথাও। কোন্-কোন্ বই থেকে রবীন্দ্রনাথ কোনো উদ্ধৃতিরও ব্যবহার করেছিলেন, পাওয়া গেল তারও হিসেব, পাওয়া গেল তাঁর সমস্ত প্রবন্ধ কবিতা গানের একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা!

কিন্তু এত কল্পনারই-বা কী দরকার? নেই কি কোথাও এ রকম? বিশ্বভারতীর রচনাবলী হাতের কাছে থাকে বলে আমার মতো অনেকে হয়তো ভালো করে লক্ষ করেন নি সরকারী রচনাবলী; লক্ষ করলে তাঁরা দেখতে পাবেন যে এর পঞ্চদশ খণ্ডের নির্দেশিকায় সাজানো আছে এই সবটাই; নতুন উদ্যমে এ রচনাবলী ছাপা হচ্ছে আবার, সেইটে জানতে পেরে খুলতে হয়েছিল এই খণ্ড। ভাবতে হয়েছিল, আমরা কি এর চেয়ে ভিন্ন কিছু চাই এবার, এর কোনো সম্ভাব্য উন্নতির পরামর্শ আছে কি কোনো

পাঠকের মনে? এখানে এমন কিছু কি আছে যার বদল বা বর্জন দরকার, অথবা সংযোজন? নিজের চাওয়াটাকে ঠিকমতো সাজিয়ে নিতে পারলে, বুঝিয়ে দিতে জানলে, পরে আর কোনো অশোভন সমালোচনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় না নিশ্চয়।

ভাবনা যখন এই পর্যন্ত এগিয়েছে শুধু, চোখের সামনে খোলা আছে কেবল অন্তিম খণ্ডের নির্দেশিকা, চমকে উঠল মন। ঠিক দেখছি কি? পাতার পর পাতা উল্টে এখানে চোখে পড়তে লাগল এমন-সব নির্দেশ, এমন-সব সংবাদ, এমন-সব মুদ্রণ, যা বিশ্বাসযোগ্য নয় একেবারে; এই খণ্ডটি ছাপা হয়েছে ঠিক বারো বছর আগে। এমন কি হতে পারে যে বারো বছর ধরে বহু মানুষ বহু যত্নে রেখে দিয়েছেন এই বই, এই তথ্যাবলী, নিজের নিজের সংগ্রহে, প্রতিবাদহীন? একটা সুবিধে অবশ্য এই যে অল্প লোকেরই কাজে লাগে এটা। কিন্তু সত্যিই দরকার হবে যাঁর? তাঁর হয়তো মনে হবে কোনো অফুরান হাসির গল্পের উৎস খুলে গেছে এখানে, আর অল্প পরেই অবসাদে ভরে যাবে মন। ভাগ্য নিয়ে বিলাপ করবার ইচ্ছে হবে তাঁর আরো একবার।

এখন, এই বারো বছর পর, এই বিলাপের হয়তো কোনো মানে নেই আর। কিন্তু অন্য দিক থেকে ভাবতে গেলে, হয়তো-বা এখনই এ-বিলাপের যোগ্য সময়। কেননা সমবেত দায়িত্বে একটা কাজ যখন হতে থাকে, কী ধরনের ভুল তখন সম্ভব সেটা বুঝে নেওয়াও দরকার। কী আমরা চাই, সে-বিষয়ে স্পষ্ট কোনো ধারণা যদি না-ও থাকে, নতুন রচনাবলীর সম্পাদকদের কাছে আমরা জানিয়ে রাখতে পারি, কী আমরা চাই না। সম্পাদকদের মনোনিবেশ ঈষৎ স্খলিত হয়ে এলেই কী ধরনের তাণ্ডব তৈরি হতে পারে, তার একটা হিসেব কোথাও থেকে যাওয়া ভালো।

২

সূচী এখানে আছে অনেক রকমের। আছে কবিতানামের সূচী, প্রবন্ধনামের সূচী, গল্পনামের সূচী; সূচী আছে কবিতার প্রথম লাইন নিয়ে, গানের প্রথম লাইন নিয়ে। খণ্ডানুযায়ী, বর্ণানুযায়ী এবং কালানুযায়ী গ্রন্থনামের তিনটি ভিন্ন তালিকাও পাওয়া যাবে এখানে। আর সবশেষে আছে বিবৃত এক উল্লেখপঞ্জী: 'রবীন্দ্ররচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ও বিষয়ের সূচী।'

উল্লেখপঞ্জী? এমন একটি উচ্চাশী এবং দিশারী কাজ এখানে আছে জেনে প্রথমে উচ্ছ্বাস জাগে মনে। এ ধরনের পঞ্জীর অভাবেই তো কত সময় অন্ধকার হাৎড়ে বেড়াই আমরা! 'উল্লেখযোগ্য' শব্দটিতে অবশ্য একটা বিপদের সংকেত আছে, পাদটীকায় যে বলা হয়েছে 'অপ্রধান উল্লেখগুলি এ সূচীতে ধরা হয়নি' তার থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে সে বিপদ। প্রধান-অপ্রধানের বিচার হবে কেমন করে? কে করবেন বিচার? কখন কার পক্ষে উল্লেখযোগ্য আর কখন-বা কার পক্ষে নয়, তার কোনো স্থিরতা কি থাকে? এ ধরনের সূচীর তাই একটা রীতিই হলো এমন কোনো বাছাইয়ের ঝুঁকি না নেওয়া। তা না হলে যে অসংগতি তৈরি হতে পারে, এ উল্লেখপঞ্জী খুললেই সেটা চোখে পড়বে।

কিন্তু তারও চেয়ে বেশি চোখে পড়বে এই যে, কোনোরকম সংকলন-নীতিই কাজ করছে না এই সংগ্রহের পিছনে। এ তালিকায় A. E, সীলি কিংবা পাস্কালের নাম পাওয়া যাবে, কিন্তু মিলবে না পোপ ড্রাইডেন কিপলিং-এর খবর, ইবসেন বা ফ্লবেয়্যার তো দূরের কথা! এ নামগুলি কি অপ্রধান তবে? এটা কি ধরে নিতে হবে যে রবীন্দ্ররচনায় ব্রাউনিঙের নাম নেই কোথাও, আছে কেবল শ্রীমতী ব্রাউনিঙের নাম? এইটে কি বিশ্বাস করতে হবে যে কীটসের কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন সমস্ত জীবনে মাত্র একবার, দশম খণ্ডের ৯৪২ পৃষ্ঠায়? দু'বার শেক্সপীয়র? অ্যাজ ইউ লাইক ইট ছাড়া অন্য কোনো নাটকের নামই বলেন নি তিনি? রবীন্দ্ররচনায় কোথাও নেই ওথেলো, কিং লীয়র, ম্যাকবেথ বা রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েটের কথা? একাদশ খণ্ডে ওয়ার্ডসওয়ার্থের মিলটন-আবাহন ছাড়া অন্য কোনো দেখা নেই ওই কবির? না, এই পঞ্জীর নজিরে, আর একবার অন্তত পাচ্ছি 'বার্নস ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজ শেলী কীটস'-এর সমবেত উদ্ধার: ১৪/৩৪১। এই তাহলে কীটসেরও দ্বিতীয় নামোল্লেখ! কিন্তু পাখির চোখে দেখে গেলেও কী করে কারো নজর এড়িয়ে যায় যে কেবল 'সাহিত্যের পথে' বইটিতেই কতবার ফিরে ফিরে আসেন রবীন্দ্রনাথের প্রিয় এই তরুণ কবিটি!

এই পঞ্জী থেকে আমরা টের পাই যে বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদেরও নাম করেছিলেন কবি, একবার। একবার না কি আছে 'বৈষ্ণব কবিতার উদ্ধৃতি', এমনকী 'উপনিষদের শ্লোক উদ্ধৃতি'ও আছে একবার। অবশ্য, উপনিষদ একবার হলেও, ভিন্ন একটি উল্লেখে বলা হচ্ছে যে ঈশোপনিষদের শ্লোক

আছে ছ'বার। শ্রীমতী পম্পা মজুমদার তাঁর শ্রমসাধ্য গবেষণায় কেবল 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' শ্লোকটিরই যে উনপঞ্চাশটি প্রয়োগ দেখিয়েছিলেন, সেটা তবে কোনো কাজে লাগল না আর! গোটা 'ছিন্নপত্রাবলী' এই রচনাবলীতে ছাপা থাকলেও ইন্দিরাদেবীর কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি খুঁজতে হবে কেবল দশম খণ্ডের ৪৭৩-৭৪ পৃষ্ঠায়, 'য়ুরোপীয় গান ও ভারতীয় গানে'র উল্লেখের জন্য খুলুন শুধু চতুর্দশ খণ্ডের ৮৯৩ পৃষ্ঠা। ইংরেজ শাসন (১৪/৮০) ইংরেজি ভাষা (১৪/৮০) বা পাশ্চাত্ত্য সমাজ (১০/৯৩৫) কথাগুলিও না কি একবার করে পাওয়া যায় তাঁর লেখায়, একবার করে পাওয়া যায় মহাভারত (১৫/২৫) বা রামায়ণেরও (১১/৫৯৮-৯৯) নাম। ঘটকর্পরের নাম অবশ্য বলেছেন একবার রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু বলেন নি কখনো ভারতচন্দ্রের কথা। 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধটি ছাড়া আর কোথাও না কি নেই চণ্ডীদাসেরও কোনো উল্লেখ।

বিষয়ের সূচী বলতে সত্যি যে কী বোঝায়, এই সূচী থেকে তা আবিষ্কার করা একটু শক্তই হতে পারে। এইসব অত্যাশ্চর্য 'বিষয়' আমরা পেয়ে যাব সংকলয়িতাদের হাত থেকে: চোখের উপর হইতে পর্দা সরিয়া গেল, আশ্রমের আকাশে শারদোৎসব, আত্মরক্ষার শক্তি অর্জনে জাপানের দৃষ্টান্ত, Evening Party-তে, গল্পগুচ্ছ বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য, চীনসভ্যতায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ নেই, দেশ মানুষের সৃষ্টি, প্রত্যাবর্তন (বিলাত থেকে), বিজয়াকে গ্রন্থ উৎসর্গ, বোলপুরের মাঠের এই ভূখণ্ড, Violet Indigo Blue Green Yellow Orange Red এবং এইরকম আরো অনেক কিছু। এই জেনে আমরা চমৎকৃত হই যে রবীন্দ্ররচনাবলীতে দুটি 'ঘটনা'রও উল্লেখ আছে: 'ঘটনা (এক বিদেশী পীড়িত হয়ে পড়েছিল)', 'ঘটনা (চাষির ছেলেকে চাকরি দেবার অনুরোধ)'! ঘটনাই বটে! কিন্তু ঠিক এই পর্যায়ে বিষয়ের সূচী করতে গেলে যে তার পরিমাণও গোটা রচনাবলীর সমানই হবে প্রায়, একথা বোধহয় ভেবে নেন নি এঁরা। ফলে যে কোনো রচনার যে কোনো শব্দগুচ্ছ হঠাৎ-হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে আসে পঞ্জীতে, কেন সেগুলি আসে অথবা তার তুল্য অন্য উল্লেখগুলি কেনই-বা আসে না, এ নিয়ে কোনো দুর্ভাবনা নেই। 'তপতী' নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রানী' বিষয়ে একটি মন্তব্য করেছিলেন: সেই আমার প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা। অতএব 'নাটক লেখার প্রথম চেষ্টা' নামে একটি বিষয় পাওয়া গেল। কিন্তু পঞ্জীর দিক থেকে তার চেয়ে অনেক

জরুরি কয়েকটি নামোল্লেখ যে আছে ওই পৃষ্ঠাতেই (রাজা ও রানী, শকুন্তলা, কালিদাস, মেঘদূত, গগনেন্দ্রনাথ), তার কোনো হদিশ পাওয়া যাবে না আমাদের এই সূচী থেকে। এখানে হঠাৎ আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ব 'কবিতা' শব্দটি নিয়ে, যার দেখা পাওয়া যাবে না কি চতুর্দশ খণ্ডের ৫০৯-১২ পৃষ্ঠায়। কী ব্যাপার হতে পারে সেটা? খণ্ডটি খুললে তবে টের পাব যে ঐ পৃষ্ঠাগুলি জুড়ে আছে 'সাহিত্যের স্বরূপ' নামের প্রবন্ধ, যার প্রথম শব্দটি হলো কবিতা! দশম খণ্ডের ৬১১-১৩ পৃষ্ঠায় আছে না কী 'ক্রন্দসী'। তিন পৃষ্ঠা জুড়ে ক্রন্দসী? মানে? মানে হলো, 'জাভাযাত্রীর পত্রে'র দুটি সংখ্যায় অন্তরীক্ষের বর্ণনা করেছিলেন কবি, শুনেছিলেন সন্তার ক্রন্দন, শব্দটি তাই এসেছিল দু'বার। তখন মনে হয়, কেবল শব্দ নয়, যেন নিষ্কাশিত ভাবেরও একটি সূত্র দেবার জন্য প্রস্তুত এই তালিকা, যেন পরীক্ষার প্রেসি লিখবারও আয়োজন হয়ে আছে এখানে। 'সাহিত্যের পথে' বইটির 'সৃষ্টি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছিলেন যে ব্যাখ্যা করে পাওয়া যায় না সাহিত্যের মর্ম, পেতে হয় তাকে প্রত্যক্ষ আস্বাদনের মধ্য দিয়ে। অনিবার্য অলংকার হিসেবে তখন চলে এসেছিল তপোভঙ্গের ছবি, মেনকা উর্বশীর অখণ্ড সুরপ্রতিমার ছবি। লিখেছিলেন: 'উর্বশীর ওষ্ঠপ্রান্তে যে হাসিটুকু লেগে আছে তার দিকে চেয়ে দেখো, স্বর্গের সহজ সুরটুকুর স্বাদ পাবে।' একেই ছেঁকে নিয়ে উঠে এল এই সূচীর সর্বোত্তম আকর্ষণ, মেদুর এবং রহস্যময়, মোনালিসার মতোই, 'উর্বশীর হাসি'।

৩

রবীন্দ্রনাথের ব্যবহার করা বিষয় আর ব্যক্তির নাম যে মাত্র ষোলো পৃষ্ঠার মধ্যে ধরে দেওয়া যায় না, এটা বুঝতেই পারি। স্খলিত, অপূর্ণ আর দিশেহারা এই তালিকা থেকে অল্প সময়েই তাই চোখ সরিয়ে নেওয়া যায়, ভাবা যায় যে কঠিন কাজের যা বাস্তব বিপদ তা ঘটেছে এখানে। কিন্তু যে সব তালিকা এর চেয়ে অনেক কম শ্রম আর কম বিবেচনাতেও সাধ্য হতে পারে, অনেক সহজ আর অনেক যান্ত্রিক যা, সেখানেও কেন এ নির্দেশিকা বারে বারেই প্রতিহত আর প্রবঞ্চিত করবে আমাদের, সেটা ভালো বুঝতে পারি না। কতটাই উদ্‌ভ্রান্ত চালে সাজানো আছে—ধরা যাক—এর কবিতানামের সূচী, যে-কোনো টুকরো

অংশ তুলে এনে একটু পরীক্ষা করা যাক তার। এই খণ্ডের ৩৯৫ পৃষ্ঠায় পাচ্ছি এইরকম কিছু নির্দেশ :

কবিতার নাম	গ্রন্থ	প্রথম পঙ্‌ক্তি	খণ্ড/পৃষ্ঠা
আধুনিক কাব্য	ছন্দ	রিচার্ড কোডি যখন শহরে [অনুবাদ : চীনে]	১৪/৩৪৯
”	সাহিত্যের পথে	এ ঘরে ও ঘরে যাবার [অনুবাদ : [Eliot]	১৪/৩৪৬
”	সাহিত্যের পথে	তুমি সুন্দরী এবং তুমি [অনুবাদ]	১৪/৩৪৪

ব্র্যাকেট প্রয়োগের ভঙ্গি থেকে শুরু করে কবিতানামের এই বিবরণ আক্ষরিকই ছাপা হলো এখানে। কবিতার নাম 'আধুনিক কাব্য'? সে কী রকম কাণ্ড? ঠাট্টা করে যদি কেউ না বলেন যে কবির রচনামাত্রেই কবিতা, তাহলে এখানে পাঠকদের ঈষৎ বিচলিত হবার অধিকার আছে। গ্রন্থনাম থেকে বোঝা গেল যে, কবিতা নয়, প্রবন্ধেরই কথা বলা হচ্ছে নিশ্চয়। কিন্তু 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধটি 'ছন্দ' বইতে? খণ্ড/পৃষ্ঠা-সংখ্যা থেকে বোঝা গেল যে ওটা বোধহয় ছাপারই ভুল, 'সাহিত্যের পথে' ছাপাই নিশ্চয় অভিপ্রেত ছিল। কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তি 'রিচার্ড কোডি' যদিও 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধের সূচনাশব্দ নয়, তবু এই পর্যন্ত এসে ভুলের কারণটা ধরা গেল। ওই প্রবন্ধে কোন্ কোন্ কবিতার প্রয়োগ আছে, সেটাই নিশ্চয় জানাতে চান সংকলয়িতা। পদ্ধতিটি যথেষ্ট সুখকর কি না সে-ভাবনাতে পৌঁছতে না পৌঁছতেই আমরা মূর্ছিত হয়ে পড়ি এই সংবাদে যে 'রিচার্ড কোডি যখন শহরে যেতেন' লেখাটি না কি এক চীনে কবিতার অনুবাদ! এড্‌ইন আর্লিংটন রবিনসনের নাম অবশ্য মূল প্রবন্ধটিতে নেই, কিন্তু তেমনি, 'চীনে কবিতা' বলেও রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেন নি এই মার্কিনী কবিতাকে, লেখাটি পড়ে তা টের পেতেও বিস্তর অসুবিধে হবার কথা নয়। অন্যপক্ষে, 'তুমি সুন্দরী এবং তুমি বাসি' যে এমি লোয়েলের কবিতা থেকে অনুবাদ, প্রবন্ধে তার স্পষ্ট উচ্চারণ থাকলেও এ-তালিকায় আমরা পাব না ওই নাম; ঠিক ওপরেই এলিয়টের নাম—হঠাৎ রোমান হরফে—বলা আছে যদিও।

'কবিতার নামের বর্ণানুক্রমিক সূচী' থেকে এই তিনটি লাইন আমি তুলে নিয়েছি একই সঙ্গে নানা ভুলের বৈচিত্র্য দেখাবার জন্যে। তা নইলে, এ

তালিকার প্রায় সর্বত্রই ছড়ানো আছে এমন সব আশ্চর্য খবর যে রবীন্দ্রনাথের কবিতানাম হিসেবে আমাদের আজ জানতে হয়: কবির অভিভাষণ, চির-কুমার সভা, ছন্দের অর্থ, ছন্দের মাত্রা, ছন্দের হসন্ত-হলন্ত, জাভাযাত্রীর পত্র, পত্রধারা প্রথম পর্যায়, বাংলাভাষাপরিচয় আর এই রকমেরই আরো অনেক নাম। আর এর ফলে, স্বভাবতই, কবিতার বই হিসেবে এখানে ছুটে আসে জাপানযাত্রী, আলোচনা, পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, খৃষ্ট, সংযোজন, সে বা শেষের কবিতা!

এ বিপর্যয় কেন ঘটছে তার একটা কারণ অবশ্য বোঝা যায়। অনেক সময়েই লেখকেরা তাঁদের আলোচনার সুবিধের জন্য উদাহরণ তুলে আনেন, উদ্ধৃত করেন হয়তো নানাধরনের কাব্যপঙ্‌ক্তি। রবীন্দ্রনাথ এ রকম অবস্থায় নিজেও তৈরি করে নিতেন অনেক লাইন, অথবা হয়তো করে নিতেন দু'চার ছত্রের অনুবাদ। কিন্তু কবিতানামের বা কবিতাপঙ্‌ক্তির সূচীতে যে এদের জায়গা চাই, এই ধারণা কি ঠিক? 'পাৎলা করি কাটো প্রিয়ে কাৎলা মাছটিরে' 'চকমকি ঠোকাঠুকি আগুনের প্রায়' অথবা 'কই পালঙ্ক কই রে কম্বল'-এর মতো কথাগুলি যে টুকটাক বানাতে হয়েছে ছন্দ আলোচনার জন্যে, তাকেও কি বলতে হবে কবিতা? কবিতা শব্দটির ওপর একটু বেশি কি জুলুম হয়ে যায় না তবে? যদি তেমন জুলুম করতেও চান কেউ তো প্রবন্ধে-প্রযুক্ত পদ্যপঙ্‌ক্তির একটি ভিন্ন সূচীর কথা ভেবে নেওয়াই কি সংগত নয়? কোনো কোনো বোধবিপর্যয় হয়তো রোধ করা সম্ভব হতো তাহলে। তার অভাবে, 'বারি ঝরে ঝরঝর নদীয়ায় বান' বা 'মন্দ মন্দ বৃষ্টি পড়ে নবদ্বীপে বান'কেও রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলে জানতে হয় আমাদের, কাব্যপঙ্‌ক্তির তালিকায় পেতে হয় 'সাহিত্যের স্বরূপ' বই থেকে 'তোমায় ঐ মাথার চূড়ায় যে রঙ আছে উজ্জ্বলি' অথবা 'সাহিত্যের পথে'র 'বিধি হে যত তাপ মোর দিকে'র মতো নিছক অনূদিত লাইনগুলি।

গানের সূচীতে পাব এমন অনেক লাইন যা 'গীতাঞ্জলি'র না হলেও মনে হবে যেন 'গীতাঞ্জলি'র; 'এখনো ঘোর ভাঙে না মোর,' 'কোলাহল তো বারণ হলো' বা 'পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো' যেমন।[১] ছোটোগল্পের তালিকায় এখানে

১ ঘটনাটা এই যে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত সূচীকেই এখানে কাজে লাগানো হয়েছে, কিন্তু লক্ষ্যে আনা হয় নি তার ব্যবহারনির্দেশ। গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি মাত্র বলা থাকলেও 'গীতবিতানে' তার সঙ্গেই আছে স্বরলিপির উল্লেখ। এই উল্লেখে বিশ্বভারতী কয়েকটি সংক্ষেপীকরণের সাহায্য নেন, যেমন 'সংগীতগীতাঞ্জলি'কে সংক্ষেপে বলা হবে 'গীতাঞ্জলি'। সরকারি সংস্করণে এই তথ্যটির

পাওয়া যাবে 'লিপিকা'র সন্ধ্যা ও প্রভাত, সতেরো বছর, প্রথম শোক, কৃতঘ্ন শোক বা পায়ে চলার পথের মতো লেখা, বৃথাই রবীন্দ্রনাথ এদের কবিতা বলে গণ্য করতে চেয়েছিলেন একদিন। এগুলি গল্প ; কিন্তু 'ব্যঙ্গকৌতুক' বইটির রসিকতার ফলাফল, সারবান্ সাহিত্য বা প্রাচীন দেবতার নতুন বিপদ-এর মতো লেখাগুলি যদি পেতে চান তো খুঁজতে হবে প্রবন্ধেরই তালিকা। সে তালিকায়, সেই প্রবন্ধসূচীতে অবশ্য আরো আছে জনগণমনঅধিনায়ক অথবা ছিন্নপত্র অথবা চিঠিপত্র। ছন্দধাঁধা বা ছন্দোহার নামেও কি রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লিখেছিলেন কখনো, কিংবা ধরা যাক 'দিলীপকুমার রায়কে' নামে কোনো প্রবন্ধ ? অন্ততপক্ষে, এই শেষটিও বললে একটু কি বাড়াবাড়ি হয় না ?

নিছক গ্রন্থনামের সহজ পল্লীতে পৌঁছেও যে স্বস্তি পাব, এমন নয়। কীভাবে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের নাম হতে পারে 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ' বা 'অবিস্মরণীয়', 'ম্যাকবেথ নাটকের অংশ' অথবা 'লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য' ? এসব নামের বই কি ছাপা হয়েছে কখনো ? অন্যপক্ষে, কেন এ তালিকায় খুজে পাব না বাল্মীকিপ্রতিভা, মায়ার খেলা, শ্যামা বা নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা-চণ্ডালিকার মতো বইগুলির নাম ; কেনই-বা 'পথে ও পথের প্রান্তে' থাকবে বিশ্বযাত্রী-বিভাগে আর 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'র জায়গা হবে পত্রাবলীতেই[২] ; কেন 'প্রাক্তনী' চলে যাবে শিক্ষা ছেড়ে বিবিধ প্রসঙ্গে ; এসব তত্ত্ব বোঝা সহজ নয়। হঠাৎ কেন 'কালান্তর' বইটির তিনটি সংস্করণের বিবরণ জড়ো হয় এখানে, সংস্করণ হিসেবে তার চেয়ে অনেক ব্যাপকভাবে ভিন্ন 'গীতবিতান'-এর হিসেব কেন থাকে না তবে, বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থতালিকায় একাধিক বইয়ের প্রকাশ-তারিখ কেন লুপ্ত হয়ে যায়, কেন-বা একই বইয়ের নাম কখনো 'সংগীত' কখনো 'সংগীতচিন্তা', কালানুক্রমিক তালিকায় কেন পাব না 'শেষের কবিতা'র মতো কোনো কোনো বইয়ের নাম, ১৩১৬ সালেই 'শান্তিনিকেতন' বইটির নাম কেন বলা হবে দু'বার, 'ঘরেবাইরে'র অনেক পরে কেন বিন্যস্ত হবে 'চতুরঙ্গ' আর কেবলমাত্র বাংলা রচনাবলীর এই তালিকায় সহসা কেন Mahatmaji and Depressed Humanity-র উল্লেখ করতে হলো, যেন

অবলোপে পাঠকেরা ধাঁধায় পড়েন। পরিচিত 'গীতাঞ্জলি' নামটি কেন বারবার ফিরে আসছে, তাঁরা বুঝতে পারেন না ঠিক।

২ আগেরটিতে কিছু ভ্রমণ-প্রসঙ্গ আছে বলে বিশ্বযাত্রী ? পরেরটিতেও তো পাব তবে কলকাতা শিলং মাদ্রাজ বোম্বাই কলম্বো র ঘূর্ণন, কেবলই শান্তিনিকেতন তো নয় !

ওই একটিই ইংরেজি লেখা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এরও কোনো উত্তর নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন বটে একবার : 'চিরপ্রশ্নের বেদীসম্মুখে চিরনির্বাক রহে / বিরাট নিরুত্তর।'

আর, মুদ্রণের অসংখ্য ভুল নিয়ে অবশ্য বিলাপ করবারও মানে নেই কোনো। ওটা হয়তো আজও আমাদের মেনেই নিতে হবে এদেশে। তবু মনে হয়, অসিতা (অমিতা) সেনের পরিণয় বা আলাতোল (আনাতোল) ফ্রাঁস বা Anna Karanina (Karenina) হয়তো সয়ে যাবে একরকম, কিন্তু চীনা কবি লি পো যখন এই নির্দেশিকায় হয়ে যান চীনা কবি থি-প্পে, 'রথীরে কহিল গৃহী' যখন হয় 'রক্ষীরে কহিল গৃহী' (পৃ ৪৪৪) বা ম্যাথ্যু আর্নল্ডের 'জুবেয়ার' যখন হয়ে দাঁড়ান 'পুবেরায়' তখনও কি আমরা কেবল সুধীন্দ্রনাথের এই লাইন উদ্ধৃত করে বলব যে এতে 'বিষাদই শুধু আছে / তাছাড়া কোনো যাতনা জ্বালা নাই' ?

৪

বিভ্রাটের এ অবশ্য কোনো সম্পূর্ণ বিবরণ নয়, এ হলো সামান্য কয়েকটি ইশারা মাত্র। কিন্তু ভাববার বিষয় কেবল এই যে কেন থেকে-থেকেই এ-ধরনের বিভ্রাটে জড়িয়ে পড়ব আমরা, কেন দিনেদিনেই নেমে যাবে আমাদের সমস্ত কাজের মান। তার একটি কারণ কি এই যে অনেকের সমবায়ে কাজ করতে আমরা অনভ্যস্ত আজ ? কারণ কি এই যে এদেশে যোগই অনেক সময়ে হয়ে দাঁড়ায় বিয়োগের তুল্য ? একজনের সঙ্গে আরেকজনের উদ্যম মিলে গেলে যখন দ্বিগুণ ভরসা পাবার কথা, তখন দেখি এক আর এক মিলে একই থেকে যায় অথবা হয়ে যায় শূন্য। কারণ, আমাদের সমবেত কাজের একটা অসুবিধে এই যে সকলেই ভাবেন এটা অন্যের দায়িত্ব, কোনো কেন্দ্রীয় বীক্ষণ বা সংহতি হয়তো বেঁচে থাকে না শেষ পর্যন্ত।

রচনাবলীর ওই সংস্করণের সম্পাদনা করেছিলেন যাঁরা, এ বিষয়ে নিশ্চয় তাঁরা অনধিকারী ছিলেন না। বিশেষ এই নির্দেশিকা খণ্ডটির কাজে লেগেছিলেন আরো যে আঠারোজন গবেষক, তাঁরাও হয়তো অযোগ্য নন তত। তবুও কেন এমন ভয়ংকর চেহারা নেয় এ বই ? কেন এত রহস্যময় হয়ে ওঠে এর প্রয়োগ-পদ্ধতি ? তখনই মনে হয় আমাদের সমবায়শক্তির দীনতার কথা, কাজ থেকে ভালোবাসা লুপ্ত হবার কথা, বিষয় থেকে ব্যক্তিরই প্রধান হয়ে উঠবার কথা।

এমন একটি কাজের প্রতিটি স্তরেই যদি-না আমরা সতর্ক রাখি আমাদের সমস্ত ক্ষমতা উদ্যম আর ভালোবাসা, যদি-না আমরা গভীর এবং সত্য কোনো দায় বোধ করি দেশ আর রবীন্দ্রনাথের প্রতি, যদি-না মনে থাকে যে এ কাজ কোনো ব্যক্তিগত সোপানচিহ্ন নয়, তাহলে বারে বারেই ফিরে আসবে এইসব প্রলাপ-কীর্তনের হট্টরোল, নিয়তির হাসিকে তখন অগত্যা আমাদের ভেবে নিতে হবে উর্বশীরই হাসি, আর ব্যবহারহীন কোনো দূরের ফ্রেমে তাকে সাজিয়ে রাখতে হবে কেবল দিনের পর দিন।

রবীন্দ্রনাথ, রেনেসাঁস ও জীবনজিজ্ঞাসা

শিবনারায়ণ রায়

[শ্রীশিবনারায়ণ রায় সম্প্রতি বেশে ফিরেছিলেন বিশ্বভারতীর আমন্ত্রিত বিশেষ অধ্যাপক হিসেবে। বর্তমান রচনাটি পাঠভবনের সমাবর্তনকালে রচিত ও ভাষণ হিসেবে পঠিত। বিশেষ অনুমতিতে একমাত্র 'বিভাবেই' এটি প্রকাশিত হলো। এর জন্য আমরা লেখক ও বিশ্বভারতীর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।—সম্পাদক]

মাননীয় উপাচার্য মহাশয়, সমবেত সুধীবৃন্দ এবং স্নেহভাজন ছাত্র-ছাত্রীরা –

আজকের এই উৎসব অনুষ্ঠানে আপনারা যে আমাকে সভামুখ্যের আসন গ্রহণ করবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছেন তাতে আমি বিশেষ সম্মানিত বোধ করছি। বিশ্বভারতীর যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনি ছিলেন এ যুগের সব চাইতে বহুমুখী প্রতিভা এবং বাংলা যাঁদের মাতৃভাষা রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশেষ করে তাঁদের ঋণ একেবারেই অপরিশোধ্য। শান্তিনিকেতনের অতিথি হওয়া যে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই সৌভাগ্য। এখানকার শালবীথিতে এবং আম্রকুঞ্জে, রাঙা ধুলোয় এবং আকাশেবাতাসে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি ছড়ানো। তাঁর বিচিত্র এবং অমেয় সৃজনীশক্তির অন্যতম প্রকাশ এই বিশ্ববিদ্যালয়, পৃথিবীর বহু দেশ ঘোরা সত্ত্বেও যার সঙ্গে তুলনীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমার অদ্যাবধি নজরে পড়েনি।

এই অনুষ্ঠানে কিছু বলবার জন্য উপাচার্য মহাশয় আমাকে অনুরোধ করেছেন। বর্তমান উপলক্ষ্যে কোনো জটিল বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়, সে চেষ্টা সঙ্গতও মনে হয় না। পরে তার সুযোগ ঘটলে খুশী হব। আপাতত সংক্ষেপে একটি সরল প্রস্তাব আপনাদের কাছে পেশ করতে চাই। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীরা এটি বিবেচনা করবেন আশা রাখি।

অধ্যয়নের নানাবিধ উদ্দেশ্য থাকে। রবীন্দ্রনাথ সচেতন প্রযত্নে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যাতে শিশু, কিশোর এবং তরুণ মনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটে। প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যে সাড়া দেবার সামর্থ্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্য এবং নাট্যাভিনয় চর্চার সূত্রে ব্যক্তির স্বকীয়তার প্রকাশ এবং কল্পনা-শক্তির সম্পোষণ, নানা দেশ থেকে বিদ্বজ্জনের সমাগম ঘটিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের চেতনাকে গ্রাম্যতা এবং আঞ্চলিকতা থেকে বৈশ্বিকতার বোধে উত্তরণ, নানাবিধ

প্রযুক্তিবিদ্যা এবং উন্নয়ন উদ্যোগের সূত্রে কৃষক এবং কারিগর সমাজের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের আন্তর সম্পর্ক গড়ে তোলা, এ সবই তিনি যথার্থ শিক্ষার অঙ্গ রূপে দেখেছিলেন। তাঁর সেই প্রচেষ্টার কতখানি আজও এখানে জীবন্ত, আপনারা তা বলতে পারবেন। তিরিশ বছর পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা এবং প্রয়াস যেমন অভিনব তেমনি অসামান্য প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন।

সর্বাঙ্গীণ বিকাশের আদর্শ স্বীকার করার পরও কিন্তু আমায় মনে হয় অধ্যয়নের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন এবং জ্ঞানের সমৃদ্ধি সাধন। এই সহজ কথাটিতে যদি আপত্তি না ওঠে তাহলে এবার আমার মূল প্রস্তাব উপস্থিত করতে পারি। সেটি হল জ্ঞান সম্পর্কে। আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে পরম্পরা সূত্রে একটি ধারণা দৃঢ়মূল যে পরাজ্ঞান, পূর্ণজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান; এই জ্ঞান পরিশুদ্ধ চেতনায় অপরোক্ষানুভূতিরূপে প্রতিভাত হয়; তারপর সেই জ্ঞান সূত্রাকারে বা মন্ত্রাকারে শব্দে প্রকাশিত হয়। এই জ্ঞান অপ্রতর্ক্য, স্বতঃসিদ্ধ, এবং প্রামাণিক। এই সব সূত্রের ভাষ্য করা চলে, তা নিয়ে প্রশ্ন করা চলেনা।

জ্ঞানসম্পর্কে পরম্পরাপোষিত এই ধারণাকে রবীন্দ্রনাথ কখনো ত্যাগ করেন নি। কিন্তু জ্ঞানের যে অন্যরূপ এবং প্রক্রিয়া পদ্ধতি আছে সে সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন, এবং আমার মনে হয় "সবুজপত্রে"র যুগ থেকে এই চেতনা তাঁর মনে ক্রমেই প্রবল হয়ে ওঠে। ব্রহ্মজ্ঞানে বিশ্বাস সম্ভবত তিনি শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন, কিন্তু অন্য চেতনা তাঁকে ক্রমেই কিছুটা দ্বিধান্বিত, কিছুটা সংশয়ী করে তুলেছে।

জ্ঞানের এই অন্যরূপটি কি? সেটি হোল এই যে স্থানকালপাত্র নির্ভর যে অস্তিত্ব সে সম্পর্কে কোনো জ্ঞানেই পূর্ণতা সম্ভবপর নয়। এই জ্ঞান আরোহী, তথ্য এবং বিশ্লেষণ-নির্ভর; এই জ্ঞান অর্জনের পথে প্রতিটি প্রকল্পই বিচার এবং প্রমাণসাপেক্ষ। এই জ্ঞান ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে; যাঁরা এই জ্ঞানের সাধনায় নিযুক্তপ্রাণ তাঁরা স্বপ্নেও ব্রহ্মজ্ঞতা দাবী করেন না। তাঁরা বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ করে এক একটি সূত্রে তাদের ধারণ করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সচেতন যে নতুন তথ্য আবিষ্কারের ফলে অথবা অপর জ্ঞানান্বেষীদের সমালোচনার আঘাতে তাঁদের প্রকল্পিত সূত্র অসম্পূর্ণ অথবা ভ্রান্ত প্রমাণিত হতে

পারে। তাঁদের অধ্যবসায়ের কেন্দ্রে যে শক্তি নিয়ত সক্রিয় তার নাম জিজ্ঞাসা। যাজ্ঞবল্ক্য, শ্রীকৃষ্ণ অথবা মনুপরাশরদের দ্বারা তাঁরা এই শক্তির সংবেশন ঘটতে দেননা। শুধু স্মৃতিকে নয়, শ্রুতিকেও তাঁরা স্বয়ংসিদ্ধ অথবা অব্যয় বলে মেনে নিতে একেবারেই গররাজী।

ভারতবর্ষেরও যে একসময়ে আরোহী জ্ঞানের চর্চা ছিল তার কিছু কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলে, কিন্তু সেই ধারা একসময়ে অবসিত হয়; কেন হয় তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা নিয়ে আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি, এখানে সে কথা তুলবনা। জিজ্ঞাসাবোধের অবচয়ের ফলে এদেশে বিজ্ঞানচর্চা প্রায় লোপ পায়, নির্ভর যোগ্য তথ্যাবলীর ভিত্তিতে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসচর্চা গড়ে ওঠেনা। তার বদলে আমাদের মননের প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্র এবং অধিকাংশ মানুষ আচারবিচারের দমবন্ধ কড়াকড়ি থেকে কিঞ্চিৎ মুক্তির আশায় আশ্রয় খোঁজে গুরুভজনায় এবং ভক্তিমার্গে। উনিশ শতকে পশ্চিমী শিক্ষার সূত্রে এদেশে আবার ইতিহাস এবং বিবিধ বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়, এবং আমার ধারণা বাংলাদেশে আমরা যাকে রেনেসাঁস আখ্যা দিয়ে থাকি সেটি মুখ্যতঃ এই পশ্চিমী শিক্ষার ফল।

এখন রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় একদিকে যেমন উপনিষদ্ অপ্রতর্ক্য জ্ঞানের সূত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি তিনি বিজ্ঞানের আরোহী, পরোক্ষ, প্রশ্নশীল এবং প্রায়োগিক রূপটিকেও বিশেষ মূল্য দিয়েছেন। কিন্তু এই দুই রূপের মধ্যে তিনি যে কোনো সার্থক সমন্বয় ঘটাতে পেরেছিলেন, এ সম্পর্কে আমার গভীর সন্দেহ আছে। বস্তুত বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনা থেকেই জ্ঞান সম্পর্কে দ্ব্যর্থক প্রতিন্যাস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উপনিষদের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান অবস্থিত এই বিশ্বাসে রামমোহন রায় বিভিন্ন নির্বাচিত উপনিষদের অনুবাদ ব্যাখ্যা এবং প্রচার করেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন যে ভারতবর্ষ যদি প্রাক্-বেকনীয় ইয়োরোপের মত তামসিকতায় আচ্ছন্ন না থাকতে চায় তাহলে ইংরেজির সূত্রে বিভিন্ন বিজ্ঞানের চর্চা এদেশে অবিলম্বে আবশ্যক। পুরো উনিশ শতক ধরে বাংলাদেশের ইংরেজিশিক্ষিত মণীষীরা মনস্থির করতে পারেননি যে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের আরোহী পদ্ধতিকেই তাঁরা প্রাধান্য দেবেন, না বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদির অপ্রতর্ক্য প্রামাণিকার ঘোষণার দ্বারা স্বাজাত্যভিমানকে তাঁরা জাগিয়ে তুলবেন। আমার সন্দেহ যে রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মত ঊর্ধ্বকোটির

ভাবুকদের ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা সম্পর্কে যে দোনামনা ভাবটি কমবেশী চোখে পড়ে অনেকটা তারই সুযোগ নিয়ে উনিশ শতকের শেষ পাদে কেশবচন্দ্র-বিজয়কৃষ্ণ-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রচারিত বিভিন্ন ধরনের ভক্তিবাদ বাঙালীর চিন্তাজগৎকে আচ্ছন্ন করে। সেই ভক্তিবাদ জাতিপ্রেমের মিশ্রণে এক প্রচণ্ড ভাবাদর্শের মাদক হয়ে ওঠে।

এখন রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও ভক্তির একটি গভীর এবং প্রবল ধারা ছিল যা বিশেষ করে তাঁর বহু সার্থক গানে উৎসারিত। কিন্তু জ্ঞানের চর্চায় জিজ্ঞাসা এবং আরোহী প্রক্রিয়াকে তিনি তুচ্ছ করেননি। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে "সবুজপত্রে"র যুগ থেকে বৈজ্ঞানিক চিন্তা পদ্ধতির ওপরে জোর তাঁর রচনায় স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। "চতুরঙ্গে"র "জ্যাঠামশাই"-এর মধ্যে তিনি যে মহা ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন অজ্ঞাবাদী পুরুষের ছবি এঁকেছেন তা থেকে সম্ভবত রবীন্দ্রমানসের বিবর্তনের কিছুটা ইঙ্গিত মেলে। পরে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর যে প্রবল মতবিরোধ ঘটে তার নানা সূত্রের মধ্যে একটি প্রধান সূত্র হল বিজ্ঞান সম্পর্কে উভয়ের চিন্তার মৌলিক পার্থক্য। এটি বিশেষ করে তাঁর "সত্যের আহ্বান" নামে বিখ্যাত প্রবন্ধে পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথ সেখানে লিখেছেন :

"মূল কথা এই যে, কারো মুখের কথায় কোনো অনুমানমাত্রের উপর নির্ভর করে আমরা সার্বজনীন কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারব না; আমরা বিশ্বাসযোগ্য প্রণালীতে তথ্যানুসন্ধান দাবী করি। তার পরে উপায়ের যথাযোগ্যতা সম্বন্ধে বিচার করা সম্ভবপর।···বুদ্ধির ভাষা মান্য করা যদি বহুদিন থেকে দেশের অভ্যাসবিরুদ্ধ হয় তবে আর-সব ছেড়ে দিয়ে ঐ অনভ্যাসের সঙ্গেই লড়াই করতে হবে।···বিশেষজ্ঞ যা বলেন তাই যে বেদবাক্য আমি তা বলিনে। কিন্তু সুবিধা এই যে, বেদবাক্যের ছন্দে তাঁরা কথা বলেন না। প্রকাশ্য সভায় তাঁরা আমাদের বুদ্ধিকে আহ্বান করেন।"

কিন্তু এসব কথা বলা সত্ত্বেও ঐ "সত্যের আহ্বান" প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বিচার বিশ্লেষণ থেকে সরে গিয়ে এমন উপমা উদ্ধৃতির প্রয়োগ করেছেন যা জিজ্ঞাসাবুদ্ধির সমর্থক নয়। তিনি লিখেছেন :

"একদিন ভারতের তপোবনে আমাদের দীক্ষাগুরু তাঁর সত্যজ্ঞানের অধিকারে দেশের সমস্ত ব্রহ্মচারীদের ডেকে বলেছিলেন—

যথাপঃ প্রবতা যন্তি যথা মাসা অহর্জরম্।
এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা॥

জলসকল যেমন নিম্নদেশে গমন করে, মাসসকল যেমন সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক থেকে ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকটে আসুন—স্বাহা। সেদিনকার সেই সত্যদীক্ষার ফল আজও জগতে অমর হয়ে আছে···"

মুস্কিল হল, প্রাচীন ভারতের তপোবনবাসী কোনো দীক্ষাগুরুর "সত্যজ্ঞান"কে যদি বিনা বিচারে এবং প্রমাণে "অমর" বলে গ্রহণ করা যায় তবে গান্ধীজির "সত্যজ্ঞান"কেই বা অসম্পূর্ণ বা ভ্রান্ত বলা চলে কোন ভিত্তিতে? জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রাধিকার মানলে গান্ধীজির প্রাধিকার অস্বীকার করা যায়না। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক গুরুই নিজের জ্ঞানের স্বয়ংসিদ্ধতা দাবী করবেন এবং চেলারা সেই দাবীর সপ্রচারে নিযুক্ত হবেন। অর্থাৎ আগের মতই বিশ্বাসের কাছে জিজ্ঞাসার বলিদান ঘটবে। আমার অনুমান ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর অনুরাগ তাঁর অনুসন্ধিৎসু যুক্তিশীলতাকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পেতে দেয়নি এবং শেষের দিকে তাঁর মনে দ্বিধা প্রবল হয়ে উঠলেও তিনি বিশ্বাস বা অপ্রতর্ক্য জ্ঞানের আশ্রয় ত্যাগ করেন নি। তিনি যে আনন্দ এবং মঙ্গল-ময়তার কথা বারবার ঘোষণা করেছেন তাঁর মত মহাশিল্পীর ক্ষেত্রে তা নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগত অনুভবের দ্বারা সমর্থিত। কিন্তু আমরা যারা এক মহাযুদ্ধের শেষে জন্মেছি, যাদের যৌবন কেটেছে আরেক মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড এবং দেশভাগের মধ্য দিয়ে, তাঁদের পক্ষে ঐশ্বরিক মঙ্গলময়তার প্রকল্প মানা প্রায় অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বানানোর মধ্যে আমি তাঁর ভাবুক হিসেবে ব্যর্থতা দেখতে পাই। রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলার রেনেসাঁস যদি ক্ষীণ হয়ে এসে থাকে, এরই ভিতরে তার একটি সম্ভাব্য কারণ মিলতে পারে।

ফলত পশ্চিমী শিক্ষার এদেশে প্রসার ঘটলেও যে অদম্য কৌতূহল এবং অক্লান্ত অনুসন্ধান বিজ্ঞানের এবং সমাজজীবনের বিকাশের মূল সূত্র, আমাদের শিক্ষার কেন্দ্রে তা আজো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আপনারা যাঁরা আগামী দশকের নবীন ভাবুক, যাঁরা সংখ্যায় স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও যাঁদের বৃত্তি এদেশের ইতিহাসকে প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম, তাঁরা যদি নিজেদের মধ্যে জিজ্ঞাসাবোধকে জাগিয়ে তুলে থাকেন এবং সেই বোধকে অপরের মনে জাগিয়ে তুলতে পারেন তাহলে আপনাদের শিক্ষা প্রকৃত ফলপ্রসূ হবে। আপনাদের কাছে আমার এই প্রত্যাশা নিবেদন করি। শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের কাছে একজন প্রবীণ-জিজ্ঞাসুর এই প্রত্যাশা কি নিতান্ত অসঙ্গত?

আলোচনা

বাংলা বানান প্রসঙ্গে

পবিত্র সরকার

বাংলা বানান / শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ / আশা প্রকাশনী, কলকাতা ৯ / এগারো টাকা।

শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষের এ বইটির প্রকাশ কলকাতার সিলেবাস-শাসিত প্রবন্ধ প্রকাশনার জগতে একটি খুব বড়ো ঘটনা। দুঃখের বিষয়, মূল্য বা প্রতিষ্ঠা যতটা পাওয়া এর উচিত ছিল তা এ বই এখনও পায় নি। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার দুটি সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ, পৌষ ১৩৮৩) বেরুবার সময় এর কেন্দ্রীয় প্রবন্ধটি ক'জনের চোখে পড়েছিল কে জানে। ছাত্ররা তো ব্যাকরণ বা বানান প্রসঙ্গে ভয় পায়, ছাত্রদের মাস্টারমশাইরাও কি পান? নইলে এ বিষয়ে মনোযোগের এত অভাব কেন?

বাংলা বানান সম্বন্ধে 'স্থিতাবস্থা' বজায় রাখার পক্ষপাতী নন যাঁরা, সেই মুষ্টিমেয় সম্প্রদায় সাধারণভাবে দুটি দলে বিভক্ত—চরমপন্থী ও নরমপন্থী। চরমপন্থীরা সমস্ত ব্যবস্থা আমূল বদলে দিতে চান, বানানকে করতে চান উচ্চারিত ধ্বনির অনুগামী। এই সংস্কারকে কেউ কেউ বলেন, 'ফোনেটিক' (Phonetic) বানান, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ফোনেটিক কথাটা ব্যবহার করা একটি বেশ মারাত্মক ভুল। ফোনেটিক বানান হয় না। ভাষা আমরা ঠিক যে ভাবে প্রতিমুহূর্তে উচ্চারণ করছি বা শুনছি তারই সঙ্গে ফোনেটিক্স বা ধ্বনিতত্ত্বের কারবার। সেভাবে লিখতে গেলে দুটি শব্দের (অর্থাৎ Word-এর) মধ্যে ফাঁক দেওয়া চলবে না—উচ্চারণের সময় দুটি শব্দের মধ্যে আমরা ফাঁক রাখি না; ভুল উচ্চারণ, তোৎলামি, কথার মাঝখানে 'অ্যাঁ-অ্যাঁ' করে কথা হাতড়ানো—সব লিখতে হবে, দাঁড়ি কমা সেমিকোলন খুব ভেবেচিন্তে ব্যবহার করতে হবে। ফলে ফোনেটিক

বানান সাধারণ শিক্ষিত লোক প্রায় পড়তেই পারবে না। 'এই যে, কোথায় চললেন মশাই হনহনিয়ে।' বাক্যটিকে 'এইজেকোথায়চোল্লেন্মোশাইহন্হোনিয়ে' লিখলে কে বুঝবে? যদি কেউ বলেন, কেন IPA Script অর্থাৎ International Phonetic Association-এর Script ব্যবহার করলেই হবে—তাতে তো যুক্তব্যঞ্জনের ঝামেলা নেই! যাঁরা এ কথা বলবেন তাঁরা সম্ভবত IPA লিপি চোখে দেখেন নি। সে লেখা সাধারণ মানুষের জন্য নয়, কেবল ভাষাতাত্ত্বিকদের জন্য। সাধারণ মানুষের রোজকার পড়ালেখার জন্য JPA Script উদ্ভাবিত হয় নি। ফলে তাতে নিয়মিতভাবে জীবন্ত ভাষার বানান লেখা চলবেও না। The Principles of the International Phonetic Association নামে যে ছোট্ট বইটি ১৯৪৯ সালে বেরিয়েছে, তার বাংলা ভাষার অনুলিপি অংশ (37 পৃষ্ঠা) থেকে একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিয়ে সমস্যার একটা আভাস দিই। প্রেসে টাইপের অসুবিধের জন্য সামান্য একটু অদলবদল করে লিখছি

utture haoa jar shujjer moddhe .....

তৃতীয় শব্দটা যে 'আর', কোন্ বাঙালি সেটা ধরতে পারবেন? কথাটা হল 'উত্তুরে হাওয়া আর সূর্য্যের মধ্যে',—অনেক সরল ও কাটাছাঁট করে, অর্থাৎ broad transcription-এ লেখা। 'আর'-এর আগে ঐ 'j'-টার উচ্চারণ হল 'য়'। প্রশ্ন হল, ওখানে 'য়' এল কোত্থেকে? উচ্চারণে আসে। 'হাওয়া'র 'আ' এবং 'আর'-এর 'আ'—দুটো ধ্বনি পরপর উচ্চারণ বাঙালির জিভে হয় না। ফলে মাঝখানের ফাঁকটায় একটা 'য়'-শ্রুতি ঢুকে পড়ে। IPA লিপিতে ধ্বনিতাত্ত্বিক বানান লিখতে হলে ওটাও লিখতে হবে। এ ধরনের ঝুঁকি নিতে কেউ রাজি আছেন কি?

যে সব চরমপন্থীরা এ ব্যাপারটা বোঝেন এবং এ বিষয়ে কোনোরকম ফাঁদে পা দেওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকেন, তাঁরা বলেন, "বেশ তো, ঐ সব শব্দের ফাঁক-টাকের এঁড়ে তর্কো তুলো না'—IPA-তেও ফাঁক আছে। বরং ফোনিমিক (Phonemic) অর্থাৎ স্বনিমগত বানান হোক। বাংলায় যেসব আস্ত আস্ত ধ্বনি আছে, যেগুলোকে বাঙালিরা একটার সঙ্গে আরেকটাকে গুলিয়ে ফেলে না, সেইগুলোর মাথাপিছু একটা করে 'বর্ণ' বেঁধে দাও। One sound one symbol হোক। রাখো বাপু তোমার স্বরবর্ণ আর 'কার'-এর ঝামেলা—'কার' তুলে দিয়ে সব জায়গাতে একটা স্বরবর্ণই বসিয়ে যাও। অর্থাৎ 'কে কে' কথাটিকে লেখো 'ককএএ' এই ভাবে।" আর, যুক্ত স্বরবর্ণ আর যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ একেবারে তুলে দাও অর্থাৎ বাংলা বর্ণমালাকে ইংরিজির মতো alphabetical করে দাও।

তাতে মুখে ধ্বনিগুলো যেমন পরপর আসে তেমনি ধ্বনির চিহ্ন অর্থাৎ বর্ণগুলোকেও পরপর লেখা হয়। আর স্বনিমী বর্ণলিপিতে উচ্চারণের ঐ হেরফের ধর্তব্য নয়, শব্দগুলোর (words) যে-চেহারা আমাদের মাথায় আছে তাই লিখব। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ('দেশ', ১১ই মার্চ, ১৯৭৮) আমার গভীর শ্রদ্ধাভাজন জগন্নাথ চক্রবর্তী এইরকম একটি প্রস্তাব দিয়েছেন।

জগন্নাথবাবুর প্রস্তাবটি এক হিসেবে লোভনীয় এবং এক কথায় তুচ্ছ করার মতো নয়। তিনি তাঁর বিষয়টি সম্বন্ধে চূড়ান্ত করে ভেবেছেন। এবং সম্ভাব্য প্রতিবাদের ক্ষেত্রগুলো আগে থেকে ভেবে নিয়ে তাঁর যুক্তি সাজিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে নানা স্থলে যে-সব কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে অল্পই সার কথা ছিল। অনেকেই যে-সব প্রশ্ন তুলেছেন সে-সব প্রাস্তিক প্রশ্ন, তা অগ্রাহ্য করলে জগন্নাথবাবুর প্রস্তাবিত পদ্ধতি ধসে পড়বে না।

আমি নরমপন্থী হিসেবে জগন্নাথবাবুর সঙ্গে এখনও একমত হতে পারি নি। তার বিস্তারিত আলোচনায় যাবার সুযোগ এখানে নেই। কিন্তু বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির ঐ প্রত্যাশিত 'অ' যাকে ইংরেজিতে inherent vowel বলা হয়, তাকে বিদায় দেওয়া মুশকিল, জগন্নাথবাবুও তা দিতে পারেন নি। অর্থাৎ বাংলা লিপিপদ্ধতির অংশত যে-আক্ষরিক (syllabic) চরিত্র আছে তা নষ্ট করা আপাতত অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, তৎসম ও তদ্ভব শব্দে এই স্বনিমী বানানের ফলে একধরনের গণ্ডগোল দেখা দেবে। শব্দ বা ধাতুরূপের একই উৎস-জাত বিভিন্ন পদের বিচিত্র বানান হবে। যেমন 'নট' কিন্তু 'নোটি', 'ঘট' কিন্তু 'ঘোটি', 'বলে' কিন্তু 'বোলছি', 'ছাপে' কিন্তু 'দেখবো'। এতে একটি paradigm পিছু বানানের সংখ্যা যেমন বেড়ে যাবে—অর্থাৎ ছেলেদের একই শব্দ বা ধাতুর রূপ অনুযায়ী যেমন বেশি বানান শিখতে হবে—তেমনি বানান থেকে এ ধরনের দুটি শব্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বোঝা যাবে না। অর্থাৎ 'বোকুন' এবং 'বকে' এই দুটি যে আত্মীয় শব্দ, কিংবা 'বোগি' যে 'বগা'র সঙ্গে অর্থের দিক থেকে যুক্ত, সেই ব্যাপারটা অস্বচ্ছ হয়ে যাবে। তাতে যাকে 'ইকনমি' বলে তা ঘটবে না, শিশুর বানান শেখার সময় শেখার item বেড়ে যাবে। আমার ধারণা, দুটি অসম্পর্কিত শব্দের একই বানান (homographic spelling) হওয়ার ঘটনাও বেশি ঘটবে। তাতে অর্থবোধের সামান্য বিশৃঙ্খলা ঘটবে। বাংলা ভাষায় বানানের অসংগতি ইংরেজি বানানপদ্ধতির চেয়ে বেশি নয়। সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ আমাদের জিভে বেশ মার খায়। কিন্তু তার মধ্যেও একটা নিয়ম আছে

—'ক্ষ' বাঙালি সব সময় শব্দের আগে 'খ' এবং মাঝখানে সাধারণত 'কখ'-ই উচ্চারণ করে। ফলে অনেক বানানের ছবি এবং আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণ—এ দুয়ের একটা অন্যোন্যতা খুব ব্যাপকভাবেই তৈরি হয়ে যায়। ইংরেজি 'o' বর্ণটির যেখানে অন্তত পাঁচরকম উচ্চারণ আছে সেখানে এ অবস্থা তেমন কিছু মারাত্মক নয়। আমি 'কার' বজায় রাখতে চাই—তবে তা উচ্চারণক্রমানুগ, অর্থাৎ linear হতে হবে, এ-কার বা হ্রস্ব-ই কারকে ব্যঞ্জনের পরে আসতে হবে, হ্রস্ব-উ, দীর্ঘ-ঊ এবং ঋ-কার কেও। যুক্তব্যঞ্জন নিয়ে আমার খটকা আছে, কিন্তু কিছু যুক্তব্যঞ্জনকে জগন্নাথবাবুর প্রস্তাব মেনে ভাঙতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু বাংলাভাষায় যে অনর্গল স্বরপরিবর্তন হয়, যাকে স্বরসংগতি বলা হয়, তার শাসন মেনে স্বরবর্ণ বদলে বানান লিখতে আমার দ্বিধা আছে।

ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ে, অর্থাৎ বানান-সংস্কারের কথা বলতে গিয়ে লিপি সংস্কারের কথা বলে, এবং গ্রন্থ-সমালোচনা করতে বসে নিজের মতামত বিজ্ঞাপিত করে নেওয়া হল খানিকটা, তার কারণ বাংলা বানানের যথার্থ সমস্যাগুলি সম্বন্ধে একটু ধারণা পাঠকের থাকা দরকার। এই সমস্যাগুলি দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি মনীষীদের উদ্ব্যক্ত করেছে। কিন্তু লিপি-সংস্কার করে বাংলা বানানের সাম্য আনার আমূল চেষ্টা না হয়ে মাঝে মাঝে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বানান সংস্কারের নানা প্রস্তাব উঠেছে। ১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে গঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার সমিতির লক্ষ্যও ছিল তাই : তৎসম শব্দের বাইরে বাংলায় যে-সব শব্দ আছে (অর্ধতৎসম, তদ্ভব, অজ্ঞাতমূল ও অন্যান্য বিদেশী ঋণ), সে সবের বানানে যথেচ্ছাচার নিবারণ করে সাম্য আনা। বাংলায় তৎসম শব্দের বানানে মূল সংস্কৃত বর্ণবিন্যাসই মান্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে—সেখানে কোনো সমস্যা ছিল না। শ্রীযুক্ত ঘোষ এ বইয়ের প্রধান প্রবন্ধে এক সঙ্গে দুটি কাজ করেছেন—ঐ সমিতির সংগঠন ও ক্রিয়াকলাপের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও মানসিকতার বিবরণ যেমন তিনি দিয়েছেন, তেমনই এর সুপারিশগুলির আলোচনা-সমালোচনা করেছেন। তিনি চমৎকার দেখিয়ে দিয়েছেন যে, বানান-সংস্কার সমিতির উদ্দেশ্য ও অর্জনে গোড়াতেই একটি অসংগতি দেখা দিয়েছিল। তৎসম শব্দের বানানে হাত না দেওয়ার সংকল্প নিয়ে তাঁরা শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবিত বাইশটি (কার্যত একুশটি, কারণ বাইশ নম্বরের নিয়ম হল 'চার নম্বর নিয়ম দেখুন'), নিয়মের প্রথম দুটিতেই তৎসম শব্দের বানানে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সুপারিশ দিয়ে

আরম্ভ করলেন তাঁরা। রেফের পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জিত হল। এর পক্ষে ও বিপক্ষে যতরকমের যুক্তি হতে পারে শ্রীযুক্ত ঘোষ তার সমস্তই উদ্ধৃত করেছেন, সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দেবপ্রসাদ ঘোষ-সংবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বিষয়টিকে অন্যভাবেও চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। তাঁর নিজের রেফের পর দ্বিত্ব বর্জনে আপত্তি আছে, কেন না তাঁর মতে, নতুন বানানে ব্যুৎপত্তি আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। যেমন 'কার্তিক' যে 'কৃত্তিকা' থেকে জাত—এই তথ্যটি বানানে চিহ্নিত থাকছে না।

পাঠকদের মনে পড়বে, একটু আগেই আমরা এই একই অপরাধে জগন্নাথ চক্রবর্তীর সংস্কারকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেছি। কিন্তু শ্রীঘোষের এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও আমাদের একটু ভিন্ন মত আছে, এবং তা আমাদের পূর্বপোষিত মতের বিরোধী নয়। আমাদের মনে রাখতেই হবে যে, 'কার্তিক' যে জাতের বাংলা শব্দ, 'কৃত্তিকা' ঠিক সে জাতের বাংলা নয়; বাঙালির সংস্কারে এ দুয়ের যোগ খুব অস্পষ্ট। দক্ষিণ ভারতে 'কৃত্তিকা' নাম চলে যেমন কবি এ. কে. রামানুজনের মেয়ের নাম ওই), সেখানে কার্তিকও দেবতা হিসেবে জনপ্রিয়—কাজেই সেখানে যদি কেউ তাদের লিপিতে দ্বিত্ব বজায় রাখতে চায়—তার পিছনে যুক্তি যতখানি প্রবল, বাংলায় ততটা নেই। আর তা ছাড়া যে-সব জায়গায় কলকাতার বানান সংস্কার সমিতির বিধান সম্ভবত পৌঁছোয় নি, যেমন অবাঙালির সংকলিত অভিধানে—সেখানেও দ্বিত্ববর্জিত বানানই লক্ষ করছি। আপ্তের (V. M. Apte) 'The Students' Sanskrit-English Dictionary' (১৯৬৩ সংস্করণ)-এ যেমন, এবং মনিয়ের উইলিয়ামসের প্রসিদ্ধ ইংরেজি সংস্কৃত অভিধানে 'কার্ত্তিক' আছে, কিন্তু 'আচার্য'ও আছে। 'আচার্য' শব্দেরও এইসব অভিধানে ঐ দ্বিত্বহীন বানানই লক্ষ করা যাচ্ছে। বুল্কের (C. Bulke, S. J.) 'অঙ্গরেজী-হিন্দী কোশ' (২য় সং, ১৯৭১)-এ 'teacher' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবেও ঐ বানান দেখছি। যতদূর মনে পড়ছে সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত সুনীতিকুমারের বই 'বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে' (জিজ্ঞাসা)-তেও 'আচার্য' বানানই দেখেছি। মনে রাখতে হবে, তৎসম শব্দগুলি সংস্কৃত শব্দ নয়, ধার-করা হলেও বাংলা শব্দ। এগুলির উচ্চারণে সংস্কৃতত্ব কিছুই বজায় নেই, কাজেই এগুলির ব্যুৎপত্তির ইতিহাস বানানে না রাখলেও চলে। বাংলা ভাষার মধ্যে এই ব্যুৎপত্তি ঘটছে না যখন।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ঘোষের একটি মূল্যবান নির্দেশ হল 'চলিত ভাষা' ও 'কথ্য' ভাষাকে পৃথক রাখার বিষয়ে। 'চলিত ভাষা' আসলে লেখার

ভাষা, ফলে সাহিত্যের রীতি, নীতি, রুচি ও ব্যাকরণের নানা সংগতির বিধান মেনে তা তৈরি হয়। কথ্য ভাষায় নীতিনিয়ম অপেক্ষাকৃত টিলেঢালা। শ্রীযুক্ত ঘোষের একথা খুবই ন্যায্য যে, "কেবল 'কথা ভাষায়' উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য রচিত হতে পারে না।" কিন্তু এখানেও 'উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য' কথাটিকে একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। তা বলতে উনি সম্ভবত উঁচুদরের 'গদ্য' বা 'প্রবন্ধ' সাহিত্যকে বুঝিয়েছেন। উচ্চশ্রেণীর গল্প-উপন্যাস জাতীয় রচনা ইংরেজিতে 'কথ্যভাষা'কে আশ্রয় করে কিছু রচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরনেস্ট হেমিংওয়ের 'টু হ্যাভ অ্যাণ্ড হ্যাভ নট', জে. ডি. স্যালিঞ্জার-এর 'ফ্র্যানি অ্যাণ্ড জুয়ি', মার্কিনী কালো লেখকদের এবং ইংল্যাণ্ডের মধ্য-পঞ্চাশের রাগী ছোকরাদের কিছু লেখা-পত্রের কথা ইতস্তত মনে পড়ে। নাটক তো বিশেষভাবেই কথ্য ভাষা নির্ভর। কিন্তু অন্যান্য গদ্যরচনা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ঘোষের কথা খুবই যথার্থ।

সংস্কার-সমিতির সূত্র ধরে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীযুক্ত ঘোষ যে নানা পার্শ্বিক মন্তব্য নিক্ষেপ করেছেন, সেগুলি বিশেষভাবে লক্ষ করবার মতো। 'পুনর্মুদ্রণ' কেন 'পুনরনুমুদ্রণ' হবে—বিশ্বভারতীর মুদ্রণকর্তৃপক্ষকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে তিনি অতিশয় বাঞ্ছিত কাজই করেছেন।

দ্বিতীয় নিয়ম 'সন্ধিতে ঙ্ স্থানে ং' সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত হল, ং-এর অতিরিক্ত বিকল্প বানান পদ্ধতিকে জটিল করেছে, এবং এ নিয়মও সংস্কৃত ধ্বনিতত্ত্বের অন্তর্গত, বাংলার নয়। শ্রীযুক্ত ঘোষ 'বাঙালী', 'ভাঙা' ইত্যাদি বানানে 'ঙ' রাখার পক্ষপাতী, কারণ তাঁর মতে পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে 'ঙগ' ধ্বনিটি আছে, যদিও স্ট্যাণ্ডার্ড উচ্চারণে 'ঙ্গ'-এর 'গ' লোপ পেয়েছে। আমাদের মতে বিবেচনাটা পশ্চিমবঙ্গ-পূর্ববঙ্গ ধরে নয়, শিষ্ট ও মান্য বাংলা, অর্থাৎ স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলা ধরে, করতে হবে। স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলা কথ্য ভাষা কোনো আঞ্চলিক ভাষা নয়, তা সব অঞ্চলের বাঙালির ব্যবহার্য ভাষা। তাতে তৎসম শব্দে ছাড়া 'ঙ্গ' উচ্চারণ নেই, শুধু 'ঙ' অবশিষ্ট আছে। বানান পদ্ধতির ঐ স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষাকেই অনুসরণ করাবার কথা—কাজেই রবীন্দ্রনাথ 'বাঙালি, কাঙালি, ভাঙা, রাঙা' লিখে অন্যায় করেন নি। এখানেও এও মনে রাখতে হবে যে, 'ঙ' বা 'ঙ্গ' বানানে যা-ই বলুক (দুরকম বানানই উপরের শব্দগুলির ক্ষেত্রে গৃহীত) না কেন, স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষী পড়বে 'ঙ', আর পূর্ববঙ্গের ডায়ালেক্ট- ভাষী পড়বে 'ঙ্গ',। তবু একাধিক বিকল্প থাকলে জিনিশটা অকারণে জটিল হয় এবং নানা কিম্ভূত ভ্রমের সৃষ্টি হয় তা থেকে—তা শ্রীযুক্ত ঘোষ খুবই বিশ্বাস- যোগ্য করে দেখিয়েছেন।

এখানে আবার ঐ ব্যুৎপত্তির প্রশ্নে ফিরে যাওয়া দরকার। 'বঙ্গ' শব্দে 'ঙ্গ', অথচ তা থেকে ব্যুৎপন্ন 'বাঙালি' শব্দে 'ঙ'—এতে যে পার্থক্য বাড়ছে তা কি আমরা অস্বীকার করতে পারি? আমার মতে তদ্ভব শব্দের শতকরা নব্বইটির বেশি 'ঙ' যে মূলত 'ঙ্গ' থেকে উদ্ভূত—এ কথা বাঙালির চেতনায় আছে, কাজেই সে ঐ 'ঙ্গ' আর 'ঙ'-এর যোগাযোগটি সহজেই খুঁজে পায়। 'ঙ্গ'—এই অস্বচ্ছ (opaque) যুক্তব্যঞ্জনটি বর্জন করে 'ঙ্গ'—এই স্বচ্ছ (transparent) বর্ণটি চালু করলেই—লাইনো ছাপায় যেমন হয়েছে—জিনিশটা আরো পরিষ্কার হয়।

হস্-চিহ্নের বিধান সংক্রান্ত নিয়মগুলির আলোচনায় তাঁর মন্তব্য "তৎসম শব্দে হস্-বর্জন গুরুতর অপরাধ"। আসলে হস্ বর্জনের নিয়ম সম্ভবত ছাপাখানার মুখ চেয়ে করা হয়েছিল। যাই হোক, আমাদের মতে এ অপরাধ তখনই গুরুতর বলে বোধ হবে যখন তৎসম শব্দকে আমরা আপাদমস্তক সংস্কৃত শব্দ বলেই মনে করব, বাংলা শব্দ বলে নয়। যে রকম করে 'ইতিমধ্যে' বা 'উপরোক্ত' চালু হয়ে গেছে সেভাবে যদি 'পৃথকীকৃত' চালু হয়ে যায় এবং বাঙালির জিহ্বা তাকে গ্রহণ করে, তাহলে তাকে অপাঙ্‌ক্তেয় মনে করার কিছু নেই। এটা মনে রাখতেই হবে যে, বাংলা একটা স্বাধীন ভাষা, তার নিজস্ব নিয়ম ও প্রবণতা আলাদা। উচ্চারণে তৎসম শব্দের উপর সে নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করেছে, বানানেই বা করবে না কেন, অন্তত যতদূর করা সম্ভব? কিন্তু শ্রীযুক্ত ঘোষের পক্ষেও জোরালো যুক্তি আছে। 'পৃথক' থেকে 'পৃথকীকৃত' যিনি করছেন—তিনি সংস্কৃত নিয়মেরই দ্বারস্থ হচ্ছেন, বাংলা নিয়মের নয়। অর্থাৎ বাংলা ভাষার স্বাধীন সম্মান মেনে বাংলা প্রত্যয় তাতে তিনি লাগাচ্ছেন না। সেক্ষেত্রে, সংস্কৃত নিয়মটা অন্তত শুদ্ধভাবে তিনি প্রয়োগ করবেন না কেন? শ্রীযুক্ত ঘোষের যুক্তি বিশেষ সারবত্তা পায় সেখানে, যেখানে তিনি দেখান, সমিতির নির্দেশের ফলে ভুল উচ্চারণ, এবং পরে তার প্রভাবে ভুল বানানের পথ প্রশস্ত হচ্ছে। 'ষড়্‌যন্ত্র' এই জন্যই 'ষড়ষন্ত্র' (শড়োজন্ত্রো) হয়ে গেছে আমাদের মুখে। তবে 'খড়্গপুর'-এর 'খড়গ্‌পুর' হওয়া, খড়গ্‌পুরে একটি স্থায়ী আবাস থাকার ফলে যতদূর জানি, সমিতির নিয়মের ফলে হয় নি। ওখানকার অবাঙালি বাসিন্দাদের মুখে তা প্রথমে হয় 'খড়্গ্‌পুর', পরে স্বরভক্তির প্ররোচনায় 'খড়গ্‌-পুর'-এ দাঁড়ায়। এককালে অবাঙালিপ্রধান ঐ শহরটির নামের এই পরিবর্তনে বাঙালিদের কৃতিত্ব তত নেই।

পঞ্চম নিয়ম হ্রস্ব-ই, দীর্ঘ-ঈ-কার সংক্রান্ত, এবং এ বিষয়েও শ্রীযুক্ত ঘোষ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের দ্বারা নির্দেশ ও আচরণের নানা অসংগতি দেখিয়েছেন। আমি নিজে সংস্কৃত-উৎসের 'তৎসম' শব্দ ছাড়া অন্যান্য শব্দের বানানে অনাদ্য ঈ-কার সাধারণত ই-কার দিয়ে লিখি কিন্তু শ্রীযুক্ত ঘোষের যুক্তি তাতে অস্বীকৃত হয় না। সমিতি ব্যতিক্রমের ক্ষেত্র যেভাবে নির্দেশ করেছেন তা যে অধিকাংশই অবৈজ্ঞানিক, তা শ্রীযুক্ত ঘোষ অত্যন্ত স্পষ্ট করেই দেখাতে পেরেছেন। 'ভুল হবার সম্ভাবনা থাকলে', 'পরিচিত ক্ষেত্রে' 'সুপ্রচলিত শব্দে' ইত্যাদি কোনো যুক্তিসিদ্ধ মানদণ্ড নয়।

সমস্ত নিয়মের আলোচনা তার পরম্পরা ধরে শ্রীযুক্ত ঘোষ যেভাবে করেছেন—তার পর্যালোচনা এই পরিসরে সম্ভব নয়। আমি সাধারণভাবে বিশ্বাসের দিক থেকে তাঁর উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে, ফলে প্রতিমুহূর্তে এই অসামান্য বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থটির সম্বন্ধে সুবিচার করতে পারব কিনা, এই আশঙ্কা নিয়ে আছি। তাঁর অনেক যুক্তি বেশ শক্তিশালী, কিন্তু তাঁর অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমি অসমর্থ বোধ করছি। যেমন 'জাঁতা, জো, জোড়া' এই সব শব্দে 'য'-তে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব। তাঁর মতে "তাতে মাতামহীরও পরিচয় থাকে, আর প্রমাতামহীরও স্মৃতি থাকে।" বানানে এগুলো কোনো বিবেচনাযোগ্য বিষয় বলে আমি মনে করি না, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর যে প্রশ্ন—"যাঁতা, যো, যোড়া' যদি অস্পৃশ্য মনে হয়, তবে এখনও 'যতন, যাতনা, যাচাই, যাচানো, যোঝা' চলছে কী করে?"—তার উত্তর আমার অজানা। আমার মতে 'যত্ন' ও 'যতন' দুইই বাংলা শব্দ, কাজেই পরেরটায় 'য' রাখা চলে আগেরটার সঙ্গে ইতিহাস ও অর্থের যোগ বোঝাতে। কিন্তু 'যাতা' ও 'যন্ত্র'-এর ইতিহাসের যোগ থাকলেও অর্থের যোগ এখন অস্পষ্ট, ফলে 'যাতা'য় 'জ' হলে কোনো ক্ষতি নেই। 'যুদ্ধ'—'যোঝা' এই জোড়টি ঐ যুক্তিতে গ্রাহ্য, কিন্তু 'যাচাই'কে 'জাচাই' করতে আমার দ্বিধা নেই। এখানে একটা কথা ওঠে—বানান একটু বদলে গেলেই যে শব্দের প্রাগিতিহাস আচ্ছন্ন হয়ে যায়—এমন হয়তো ভাবা উচিত হবে না। ভগ্নতৎসম শব্দে বানানের একটু রূপান্তর ঘটেছে, মূর্ধন্য-ণ-র জায়গায় দন্ত্য-ন আসছে বলে শ্রীযুক্ত ঘোষ এইরকম আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। মনে রাখতে হবে, উচ্চারণের দিক থেকে দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ-র কোনো তফাত নেই বাঙালির কানে, ফলে সে যখন 'মাণিক্য' আর 'মানিক', 'প্রাণ' আর 'পরান' 'কোণ' আর 'কোনা' কানে শুনছে তখন এই তৎসম-অর্ধতৎসম জোড়গুলির সদস্যদের ঘনিষ্ঠ যোগ সে অর্থের সাহায্যেই ধরে ফেলছে। আমরা

বেশির ভাগ সময়ে বাংলা শিখি কানের সাহায্যে। পরে বানানে যে বিষমতা দেখি তাতে হয়তো আমাদের খটকা লাগে, কিন্তু ব্যাকরণের সাহায্যে একরকম করে তার একটা ব্যাখ্যাও পেয়ে যাই—যে, একটা 'তৎসম' শব্দ, আরেকটা তা নয়। আর এটাও বোধহয় স্বীকার করতে হবে যে সংস্কৃত 'গণ্' আর বাংলা 'গন্' (আসলে 'গোন্') দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ধাতু। এই কারণেই আলাদা যে, দুই ভাষার ব্যাকরণ এবং ধাতুরূপ সম্পূর্ণ আলাদা। আর আমার মতে, "খাঁটি সংস্কৃত শব্দ" বলে বাংলায় কিছু নেই।

অন্যত্র লেখক 'অন্ততঃ, ক্রমশঃ, বিশেষতঃ' ইত্যাদি শব্দের অন্ত্য বিসর্গটি রেখে দেওয়ার পক্ষপাতী। তাঁর যুক্তি, ঐ "বিসর্গটিকে বিসর্জন করলে অন্তের অ-ধ্বনিও উঠে যাবে।" এই আশঙ্কা যথার্থ নয় বলেই আমার বিশ্বাস। এখানেও কান যদি শব্দটিকে ঠিক তুলে নেয়, বানানে বিসর্গের অভাব তার অন্ত্য অ-কারের রদবদল ঘটাবে না। 'পুনঃপুন, ইতস্তত', (কিংবা 'মুহুর্মুহু') ইত্যাদি বানানে মধ্যবর্তী বিসর্গ বা তা থেকে জাত 'স্' বা 'র্' থাকলেও পদান্তে বিসর্গ রাখার কোনো দরকার নেই। এই জন্যে নেই যে, এগুলি আমরা যেভাবে শুনছি বা পড়ছি ('পুনোপ্‌পুনো' বা 'পুনোহ্‌ পুনো' ইত্যাদি), তাতে মধ্যের ঐ বিসর্গের উচ্চারণ-গত একটা প্রতিক্রিয়া আমরা পাচ্ছি, কিন্তু অন্তবর্তী বিসর্গের উচ্চারণ হচ্ছে না। সে বিসর্গ না দিলে যদি কেউ ভুল উচ্চারণ করে তবে তা শোধরানোর অবকাশও থাকবে—সেটা কোনো সমস্যা নয়।

শ্রীযুক্ত ঘোষ একটি অতিশয় সংগত প্রস্তাব দিয়েছেন—বাংলা 'অ্যা' ধ্বনির একটি নিজস্ব বর্ণ এবং 'কার' তৈরী করার। এই অতিশয় বাঞ্ছিত চিহ্নদুটির রাজশেখর বসু উদ্ভাবিত দুটি নমুনাও তিনি পেশ করেছেন। চিহ্নদুটি সম্বন্ধে সমালোচনা এই যে, ইংরাজি a-র মতো দেখতে প্রস্তাবিত মূল বর্ণটি বাংলা লেখার তোড়ে লেখা সহজ হবে কিনা বুঝতে পারছি না—বাংলা লেখায় কলমের যে স্বাভাবিক গতি বা direction, তাতে ওটি খাপ খাবে বলে মনে হয় না। আর 'ে' বা এ-কারের মতো দেখতে তার কার-চিহ্নটিও বড্ড বেশি এ-কার ধর্মী, দ্রুত লেখায় এ দুয়ের তফাত স্পষ্ট বজায় রাখা মুশকিল হবে।

বলা বাহুল্য, প্রবন্ধটি বিরাট ও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বলেই আমাদের প্রশ্ন, সংশয় এবং অনুসন্ধিৎসার পরিমাণও বেশি হয়ে পড়ছে। তাছাড়া এর সর্বত্র এত মূল্যবান নির্দেশ এবং অন্তর্দৃষ্টির সাক্ষাৎকার ঘটে যে, এর তাত্ত্বিক প্রাচীনপন্থাকে অতিক্রম করে এর ব্যাবহারিকতা অনেক বড়ো হয়ে ওঠে। বিদেশী শব্দের

বানানের আলোচনায় (এই প্রবন্ধ এবং 'প্রতিবর্ণীকরণ') শ্রীযুক্ত ঘোষের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত নির্ভুল ও যুক্তিসিদ্ধ। হ-এর নিচে দন্ত্য-ন বসিয়ে যে একটি টাইপ আমাদের ছাপাখানায় আছে—একথা আমি তাঁরই লেখা ('বর্ণ-বিভ্রান্তি') থেকে প্রথম জানলাম। অবিলম্বের সে টাইপটির নির্বাসন দরকার। 'কতিপয় শব্দের বানান' প্রবন্ধটি ছাত্রদের (অর্থাৎ আমাদের মতো বানানব্যবসায়ী সকলেরই) বিশেষ উপকারে আসবে। ১৩৮ পৃষ্ঠার 'ঈর্ষা' বানানটি সম্বন্ধে শুধু একটু খটকা জাগে। এর প্রাচীন ষ-ফলাটি লুপ্ত হল কোন্ নিয়মে?

বানানে সাম্য কীভাবে আনা যাবে জানি না। যেখানে একাধিক বিকল্পের ব্যবস্থা আছে এবং যেখানে স্বেচ্ছাচারের সুযোগ দুর্লভ নয়, সেখানে শ্রীযুক্ত ঘোষের এই মনস্বী ও আন্তরিক প্রয়াসের মূল্য কী দাঁড়াবে কে জানে? কিন্তু এই সমালোচকের মতে শ্রীযুক্ত ঘোষের যথার্থ সাফল্য তাঁর 'ব্যাকরণ-জিজ্ঞাসা' শীর্ষক ক'টি প্রবন্ধে, বিশেষ করে 'নির্দেশক-সঙ্কেত', 'কর্মকর্তৃবাচ্য' এবং বাংলা বাক্যবিন্যাসে কর্মবাচ্য'—এই তিনটি প্রবন্ধে। এগুলি পড়ে শুধু এই একটি কারণেই কারণেই অতৃপ্তি জাগে যে, লেখক ব্যাকরণ সম্বন্ধে এত কম লিখলেন। 'টি-টা' যে প্রত্যয় নয়—সে সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার আগে শ্রীযুক্ত ঘোষ তথ্য ও যুক্তির যে প্রাকার নির্মাণ করেছেন, তা কখনো ভেঙে পড়বে না বলেই আমার বিশ্বাস। বস্তুত তাঁর এই লেখাগুলি পড়ে মনে হয়, এমন একটি বাংলা ব্যাকরণ তাঁর রচনা করা উচিত, যাতে ভাষার স্বরূপটি যথার্থ প্রতিভাত হয়। এ কাজে তাঁর মতো যোগ্য লোক দুর্লভ। 'টা-টি'কে প্রত্যয় বলার একটি কারণ বোধ হয় বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বে বা Des ription Linguistics-এ ধাতু বা শব্দপ্রকৃতির সঙ্গে পদগঠনের জন্য জুড়ে দেওয়া যে-কোনো বদ্ধ রূপ (bound morpheme)-কে suffix আখ্যা দান। ব্লুমফিল্ড প্রভৃতি ভাষাতাত্ত্বিক suffix এই সতরঞ্জির নিচে বিভক্তি, প্রত্যয়, বিশেষক (specifier, নির্দেশক ইত্যাদি যাবতীয় পদান্ত-উপাদানকে জড়ো করেছেন। এই ভ্রান্ত সংজ্ঞা থেকে নিছক বঙ্গানুবাদের সূত্রে 'প্রত্যয়' কথাটি 'টা টি' সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হয়েছে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে শ্রীযুক্ত ঘোষের মতো একজন সতর্ক ব্যাকরণ-জিজ্ঞাসু এখনও আছেন, যাঁর নির্দেশের আমাদের স্বেচ্ছাচার মাঝেমাঝে ব্যাহত হয়।

'কর্মকর্তৃবাচ্য' প্রবন্ধটিতেও লেখক প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণের আরেকটি বিদঘুটে ভ্রান্তি দেখিয়ে দিয়েছেন। যে ক্রিয়া অকর্মক, তার 'কর্মকর্তৃবাচ্য' হয় কী করে—এ অতিশয় সংগত প্রশ্ন। ফলে 'বাঁশি বাজে', 'আম পড়ে', 'দেশ ভাসছে'—সবই

যে কর্তৃবাচ্য—এই সিদ্ধান্তের জন্য লেখককে উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ দিতে ইচ্ছে হয়। গড্ডলপ্রবাহের মধ্যে এই একজন যথার্থ ব্যাকরণ-দ্রষ্টাকে আবিষ্কার করে আমরা উল্লসিত বোধ করি। তবে এখানে তাঁর একটি পর্যবেক্ষণ এই যে, "যে-কোন অকর্মক ধাতুতেই আ-কার যোগ করিলে উহা প্রেরণার্থক হইবে এবং সকর্মক হইবে এবং তাহার অর্থও বদলাইয়া যাইবে" (১০৬ পৃষ্ঠা)। এটি সর্বাংশে যথার্থ নয়। তার কারণ যে-কোনো অকর্মক ধাতুর সঙ্গে আ-কার যোগ করা সম্ভব নয়; যেমন, আ-কারান্ত সাধিত কিছু অকর্মক ধাতু দাঁড়া, ঘুমা, সাঁৎরা, ধমকা—ইত্যাদি, কিংবা সিদ্ধ চল্-('চলানো', স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলায় চলে না', 'পড়্' ('পড়ানো' পতন ঘটানো অর্থে সন্দিগ্ধ প্রয়োগ) ইত্যাদি। আবার আজকালকার অর্থনির্ভর Generative Semantics নামক ব্যাকরণতত্ত্ব যদি গ্রহণ করি, তাহলে আ-কারান্ত ছাড়াও প্রেরণার্থক বা নিজস্ব ধাতুর সন্ধান পাই বাংলায়। ভাষাতত্ত্ববিদ জেমস ডি মেকলি (James D McCawley) ইংরেজি kill ধাতুটিকে প্রেরণার্থক বলেছেন। কারণ তাঁর মতে অর্থের দিক থেকে ওটিকে ভেঙে CAUSE TO DIE এই ভাবটি লাভ করা সম্ভব। এ নিয়ে তর্ক আছে, কাজেই খুন কর্ ক্রিয়াটি বাংলায় প্রেরণার্থক এই দাবি এখনই করছি না আমরা, কিন্তু আমাদের মতে 'মার্', 'মেরে ফেলা' অর্থে 'পাড়্-' 'নাড়্-' ইত্যাদি ধাতু প্রেরণার্থক, যদিও সেগুলি কোনো অকর্মক ধাতুর সঙ্গে আ যোগ করে তৈরি হয় নি। কিন্তু এ প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের প্রতি এই সমালোচকের সোৎসাহ সমর্থন আছে।

পরবর্তী 'বাংলা বাক্যবিন্যাসে কর্মবাচ্য' প্রবন্ধটিও বিচারের দিক থেকে অত্যন্ত আধুনিক। তিনি চমৎকার দেখিয়েছেন যে, প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণে যাকে কর্মবাচ্য বলা হয় তার অধিকাংশ আদৌ কর্মবাচ্য বলে গণ্য হতে পারে না। তাঁর অকাট্য যুক্তি "কর্মপদ যদি ক্রিয়াপদকে নিয়ন্ত্রণ না করে, তাহা হইলে বাচ্য আর যাহাই হউক, 'কর্মবাচ্য' আখ্যা পাইতে পারেন।" (১০৮ পৃষ্ঠা)। ফলে 'বইটি পড়া হল' কর্মবাচ্য নয়, 'তিনি গত হইয়াছেন'-ও নয়। এগুলিও কর্তৃবাচ্য। বাংলা Surface ব্যাকরণের সূত্র অনুযায়ী এ সিদ্ধান্ত নির্ভুল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে অতিশয় মূল্যবান এই সব কথা বঙ্গীয় প্রধান শিক্ষক সমিতির মুখপত্রের মতো ধূসর একটি আধারে পড়ে থাকে। আর বইয়ে পরিবেষিত হলেও এ নিয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য শোনা যায় না। আগেই বলেছি, বানান সংক্রান্ত প্রবন্ধটির গুরুত্ব কম নয়, কিন্তু শ্রীযুক্ত ঘোষের এই ব্যাকরণ বিষয়ক প্রবন্ধগুলিই ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে তাঁর যথার্থ শক্তি ও অনন্যতার

নিদর্শন। এগুলি পড়েই তাঁর কাছ থেকে এ সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ পাবার ইচ্ছে জাগে, তাঁর বয়সের কথা মনে রেখেও আমাদের ঐ প্রার্থনা দিয়ে তাঁকে পীড়িত করতে ইচ্ছে হয়। তাঁর ধারণা ও অন্তর্দৃষ্টিগুলিকে মিলিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ বাংলা ব্যাকরণ রচনায় যদি তিনি হাত দিতেন তাহলে খাঁটি বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ স্বরূপ-নির্দেশক ব্যাকরণ আমরা তাঁরই হাত থেকে পেতাম। এই দাবি আমরা তাঁর সময়ের খুব বেশি লোকের কাছে করতে পারি না। বাংলা ভাষার যে-কোনো ছাত্রের এ বইটি সযত্নে ও সশ্রদ্ধভাবে লক্ষ করা উচিত।

প্রবন্ধ

শিক্ষাচিন্তা চমৎকারা

গুণানন্দ ঠাকুর

বঙ্গদেশে শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে সকলেই এক একটি বিশেষ মত পোষণ করেন। কেহ কেহ মনে করেন তিনিই জানেন এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুরস্ত করিতে প্রয়োজন কিসের। গুণানন্দ নির্ভেজাল বঙ্গসন্তান। বঙ্গজ সমস্ত দোষ তাহার মধ্যে বিদ্যমান। তদুপরি বিভাব সম্পাদক শ্রীমান সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত গুণানন্দকে কিঞ্চিৎ প্রশ্রয় দিয়া থাকেন সুতরাং গুণানন্দ ঠিক করিয়াছে শ্রীমানের প্রশ্রয়ের সুযোগ গ্রহণ করিয়া আপনাদের বঙ্গদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তাহার নিজস্ব মতটি নিবেদন করিবে। তবে পাঠক শুনিয়া থাকিবে মদীয় দেশে একটি গভীর কাগজ সংকট আসিতেছে সুতরাং গুণানন্দ তাহার বক্তব্য সংক্ষেপ করিয়া শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য পেশ করিবে।

ইহার অর্থ এই নয় যে গুণানন্দ প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করে নাই। গুণানন্দ বঙ্গ সন্তান পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং যে কোন বিষয়ে তাহার একটি নিজস্ব সুচিন্তিত মত আছে। কিন্তু স্থান সংকোচ বলিয়া মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে গুণানন্দ তাহার মত সংবরণ করিয়াছে।

পুণ্যভূমি বঙ্গদেশে মা ষষ্ঠীর কৃপায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাব নাই। ভারতের তিনটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গুণানন্দের শিক্ষাধাত্রী। পাঠক এই স্থলে ললাটে হস্ত স্পর্শ কর। এই মহিমময়ী শিক্ষাধাত্রী সম্বন্ধে গুণানন্দ অচিরেই তোমাকে অবহিত করিবে। নগর কলিকাতায় এই বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও আরো দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে—একটির নাম যাদবপুর, অপরটি রবীন্দ্রভারতী। শহর ছাড়াইয়া অগ্রসর হও, কল্যাণী নামক জনপদে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় পাইবে

একটির নাম কল্যাণী (অহো কি সুন্দর নাম) অপরটি পুণ্যশ্লোক বিধান চন্দ্র রায় নামাঙ্কিত বিধান চন্দ্র রায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। মহাপুরুষের লীলাভূমির উত্তরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, নাম উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। ইতি হয় নাই। বর্দ্ধমানের বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ভুলিও না। ভুলিও না কবিগুরুর পদধূলিসম্বলিত পূতভূমি শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে।

যে ভূমিতে এত বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে নিশ্চয় বিশ্ববিদ্যার মহোৎসব নিত্য চলিতেছে মনে হইতে পারে। পাঠক সে ভুল কদাপি করিবে না। কৃষকের ধনাগম হইলে যেরূপ তাহার ঘড়ি ক্রয় করিবার ইচ্ছা জাগে—নির্ধন স্বামীরও স্ত্রীর যেরূপ স্বর্ণালংকারের আগ্রহ সতত বর্তমান থাকে, কলিকাতার মধ্যবিত্ত যেরূপ কর্জ করিয়াও দূরদর্শন যন্ত্র ক্রয়েচ্ছু, সেইরূপ বঙ্গদেশ তথা মহিমময় ভারতবর্ষের জনগণের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় থাকিলে অঞ্চলের মর্য্যাদাবৃদ্ধি হয়। সেই কারণে মেদিনীপুরে প্রাতঃস্মরণীয় এক ব্যক্তির নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আন্দোলন চলিতেছে। গুণানন্দ বিদ্যাসাগরের ভক্ত সেই হেতু এই প্রস্তাবে সে ভীত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সাধারণভাবে এখন নোংরামোর পীঠস্থান। বিদ্যাসাগরের চরম অপমান আগতপ্রায়। এই প্রকারের আন্দোলনের ফলে ভবিষ্যতে বেলমুড়ি, গিধ্‌নী-চাংড়িপাতা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি অতিমাত্রায় সম্ভব।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এখন এক একটি চূড়ান্ত অরাজকতার ক্ষেত্র। সরকারের বদান্যতায় অর্থের কোন অভাব নাই। তাই লুটিয়া পুটিয়া খাইয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা চারিদিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত তিনটি যুযুধান দল আছে। প্রথম দল প্রশাসন। তাহাদের মধ্যেও আবার দুই দল আছে—কুলীন অফিসারকুল, আর অকুলীন কিন্তু প্রচণ্ড সংগ্রামী করণিকের দল। প্রশাসনিক দল সর্ব্বদা একটি সাধনায় মত্ত—ন্যূনতম (কিংবা শূন্য) কর্ম সম্পাদন করিয়া যথাসাধ্য বেশী বেতন সংগ্রহ করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসারবৃন্দের ক্ষুরে গুণানন্দ দণ্ডবৎ হইতেছে। সারা বিশ্বে আপনাদের তুলনা নাই। আপনাদের ধারণা আপনারা আই এ এস অফিসারদের সম কর্মক্ষম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্নসম অধ্যাপকদের সদৃশ বিদ্বান। তাহার ফলে আপনারা অধ্যাপকদের মতো কর্মক্ষম এবং আই এ এস অফিসারদের মতো দুবিনীত। আপনাদের কর্মস্থলে পাওয়া আশাতীত সৌভাগ্য, কর্মরত অবস্থায় দর্শন করা আকাশকুসুম দর্শনের ন্যায় অসম্ভব। আপনাদের অসামান্য অপদার্থতার শিকার যে সব লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী তাহাদের

নিশ্বাসে যদি আগুন থাকিত তবে আপনারা বহুপূর্বে ভস্ম হইয়া যাইতেন। দুঃখের বিষয় তাহা হয় না। অকুলীন কেরানীকুল আরো ভাল। তাঁহারা অফিসারকুলের সমস্ত দোষে দোষী উপরন্তু তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি কারখানা বলিয়া জ্ঞান করেন। ফলে তাঁহারা কোন সময়েই তাঁহাদের নির্ধারিত কর্ম সম্পাদন করেন না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ বিল্ডিং হইতে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং পর্য্যন্ত এই দুইশত গজ রাস্তা অষ্টমাস ধরিয়া অতিক্রম করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া এইবার বি এস সি পার্ট ওয়ানের ছয় হাজার ছাত্রের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইতে পারে নাই। অন্য কোন দেশ হইলে কাহাকেও অন্তত জবাবদিহি করিতে হইত, কাহাকেও অন্তত শাস্তি পাইতে হইত। এই কমিশনলাঞ্ছিত ভারতে কোন অপকর্মের শাস্তি হয় না। সেই কারণে আমাদিগকে এই প্রকার অলস দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যক্তিগণকে পুষিবার জন্য অর্থব্যয় করিতে হইতেছে। রাজনীতিতে আপনাদের যে উৎসাহ, কর্মে আপনাদের সে উৎসাহ দেখিলে বঙ্গবাসী ধন্য হইবে।

শিক্ষক সমাজ সম্বন্ধে লিখিতে ভীতি হয়। আপনারা শিক্ষকতার মহান্ ব্রত লইয়াছেন অথচ শিক্ষকতায় আগ্রহ আছে, আপনাদের মধ্যে এমন ব্যক্তির সংখ্যা মুষ্টিমেয়। শিক্ষা ব্যতীত আর সমস্ত ব্যাপারে আপনাদের আগ্রহ। আপনারা নোটবই লিখিতে পারদর্শী, আপনারা বিভিন্ন প্রকাশক সংস্থানের পক্ষে পুস্তক অনুবাদে উৎসাহী, রাজনীতিতে আপনারা অগ্রণী, কেহ কেহ ব্যবসায়েও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, অধুনা দূরদর্শনের সাংস্কৃতিক বিভাগ তো আপনাদের সহায়তা বিনা একদম অচল। আপনারা আজ বহু বৎসর হইল জঙ্গী হইয়াছেন। তাহার ফলে আপনাদের বেতনক্রম আই এ এস অফিসারদের সমান হইয়াছে। কি স্বর্গসুখ! পড়াইবার হাঙ্গামা নাই বৎসরের দুই তৃতীয়াংশ ছুটিতে কাটে। পরীক্ষার খাতা মুদীর দোকানে বিক্রী করিয়া অতিরিক্ত আয়ের পথও কেহ কেহ লইয়া থাকেন। তবে অক্ষিপত্রের উৎপাতে কিছু করিতেই হয় তাই আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দলাদলির আখড়াতে পরিণত করিয়াছেন। যে কোন নিয়োগ, যে কোন অনুদান বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিলে আপনারা যে কামড়াকামড়ি সুরু করেন তা দেখিলে ভাগাড়ের শকুনিরাও লজ্জা পাইবে। আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে ঢুকিয়াছেন। সেইসব স্থান অতি মনোরম। আগড়ম বাগড়ম লিখিবেন তাহা রাষ্ট্রের কোষাগার ধ্বংস করিয়া ছাপাইবেন তাহার পর পত্র পত্রিকায় তাহার সমালোচনা করিয়া পরস্পরের পৃষ্ঠ

কণ্ডূয়ন করিবেন। অতি সুন্দর ব্যবস্থা। শুধু করদাতাগণের ব্যতীত কাহারও লোকসান নাই।

যুযুধান দলগুলির শেষ দল ছাত্রসমাজ। ছাত্রদল স্রোতস্বিনীর মতো নিয়ত বহমান। মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্র অবশ্য ছাত্রজীবনকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে তাহারা রাজনৈতিক দলের কুনকে হস্তী তাহাদের কথা বাদ দেওয়া যাউক। বাকী যাহারা আছে তাহাদের মধ্যে একটি দল নিশ্চয় আছে যাহারা লিখন পঠনে আগ্রহী কিন্তু মুষ্টিমের কয়েকজনকে বাদ দিলে বাকীরা পরীক্ষা পাশেই আগ্রহী; বিদ্যার্জ্জন যদি কিছু হয় তবে তাহা নিতান্তই আকস্মিক। ছাত্ররা জানিয়া গিয়াছে বঙ্গদেশে পরীক্ষা একটি প্রহসন। যাহাদের মুরুব্বী আছে তাহারা পরীক্ষা না দিয়াও পাশ করিতে পারে। পরীক্ষার ফল যাহাই হউক না কেন তাহারা উত্তম কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে স্থান পায়। ছাত্ররাও তাই বিদ্যার্জ্জনের চেষ্টা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করে না, তাহারা পরীক্ষা পাশের চেষ্টা করিয়া থাকে। তাহাতেও তাহারা সাফল্য লাভ করে না। বঙ্গদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের বিশাল একটা অংশ অকৃতকার্য হইয়া থাকে। তাই ছাত্ররা পরীক্ষার আগের ছাত্রজীবন নানা আনন্দে কাটাইয়া থাকে। বঙ্গদেশে ক্রীড়াবিদ নাই ক্রীড়ামোদী আছে। তাহারা ক্রিকেট ফুটবল হাডুডু ইত্যাদি ক্রীড়ায় সময় ব্যয় করে। হিন্দী সিনেমা শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখে এবং রাজনৈতিক কামানের খাদ্য হইয়া জীবন সার্থক করে। যাহাদের মুরুব্বী রহিয়াছে তাহারা জানে তাহারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবে; যাহাদের নাই তাহারা জানে তাহাদের কোন আশা নাই। সুতরাং উভয়পক্ষই আনন্দে কালাতিপাত করে।

ইহার ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। বিন্দুমাত্র শিক্ষা না পাইয়া যে সব কর্ম করা চলে যেমন শিক্ষকতা, করনিকের কাজ, কিংবা বিশুদ্ধ আলস্য ছাড়া অন্য কোন কর্ম আর বঙ্গসন্তানদের ভাগ্যে জুটিতেছে না। সংবাদপত্রে বিলাপ করিলে লাভ হইবে না। দলমত নির্বিশেষে স্বীকার করা প্রয়োজন যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আজ সমূহ সর্ব্বনাশের সম্মুখীন। এই সর্ব্বনাশ কাহারা করিতেছে তাহা জানিতে বেশী পরিশ্রম করিতে হইবে না। দলমতনির্বিশেষে একাগ্রচিত্তে এই সমস্যার সমাধান করিতে আগুয়ান হইতে হইবে।

গুণানন্দের ইচ্ছা ছিল যে সে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমস্যা লইয়া আলোচনা করিবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে বিস্তর বকিয়াছে। বারান্তরে শ্রীমান সমরেন্দ্র পুনশ্চ প্রশ্রয় দিলে দেখা যাইবে। বর্ত্তমানে গুণানন্দ ক্ষান্ত হইতেছে।

বাংলা পীর-সাহিত্যের উৎপত্তি

গিরীন্দ্রনাথ দাস

পীর বলতে সাধারণভাবে আমাদের মনে হতে পারে যে তিনি ঐশী শক্তিসম্পন্ন মুসলিম মহাপুরুষ এবং সকলের শ্রদ্ধাভাজন। তিনি নিরাশার আশা; তিনি সম্ভবকে অসম্ভব এবং অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। গ্রাম গরম হলে অর্থাৎ কোন গ্রামে কলেরা-বসন্ত প্রভৃতি রোগের কোনটি মহামারী আকারে দেখা দিলে তিনি তা অনায়াসে ঠাণ্ডা বা শান্ত করতে পারেন। তাঁর আশীর্বাদে বন্ধ্যা রমণী সন্তানবতী হন, বন্ধ্যা গাছ ফলবতী হয়, নির্ধন হন ধনবান। তাঁর অভিশাপে ধনশালী ব্যক্তি ফকির হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ান। তিনি নাকি মানুষ থেকে মাছি, মাছি থেকে মানুষ হতে পারেন, বৃদ্ধ থেকে শিশু বা শিশু থেকে যুবক হতে পারেন। তিনি নাকি গলায় হাত বুলিয়ে ফুটে যাওয়া সিঙ্গি গাছের কাঁটা বেমালুম নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন, শূন্য পুকুর নাকি পানিতে টই-টম্বুর করতে পারেন,—এক দণ্ডে শত শত যোজন পথ অতিক্রম করতে পারেন, ইত্যাদি।

তাঁর শান্ত-সৌম্য চেহারা। মুখ ভর্তি পাকা গোঁফ-দাড়ি। পরনে বুঝি ধোপদুরস্ত সাদা আলখাল্লা; একহাতে 'আশাবাড়ি' বা চিম্‌টা,—অন্য হাতে কমণ্ডলু।

পীরকে নিয়ে সাহিত্য রচিত হল কেন? এর উত্তরে যদি কেউ বলেন যে,—রামকে নিয়ে রামায়ণ, কৃষ্ণকে নিয়ে কৃষ্ণকীর্তন, সখীকে নিয়ে সখীসংবাদ, আপনাকে নিয়ে আত্মজীবনী যদি রচিত হতে পারে তবে পীরকে নিয়ে পীর-সাহিত্য রচিত হবে না কেন!

কিন্তু পীর-সাহিত্য সৃষ্টি হওয়ার কারণ আরো ব্যাপক এবং গভীরতর।

বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়'। এটি ধর্মভিত্তিক রচনা। বলা বাহুল্য, আর্যভাষায় রচিত সব সাহিত্যের ভিত্তিই ধর্মভিত্তিক। পীর সাহিত্যও ধর্মীয় ধারায় আবির্ভূত হয়েছে।

ধর্ম কথাটি যতদিন সর্বাধিক প্রচলিত ছিল ততদিন বাংলা সাহিত্যের স্তর পরম্পরায় নানা শাখায় তা চিহ্নিত হয়ে এসেছে। যথা, বৌদ্ধ-সহজযানী

প্রভাবিত, ব্রাহ্মণ্য প্রভাবিত, বৈষ্ণব প্রভাবিত, শাক্ত প্রভাবিত, সুফীবাদ প্রভাবিত ইত্যাদি।

আধুনিকালে ধর্ম কথাটি বাদ দিয়ে এল 'বাদ' বা 'মতবাদ' কথাটি। কারণ ধর্মের নামে যত হতে লাগল কল্যাণ,—স্বার্থবাদী শ্রেণীর হাতে পড়ে তার চেয়ে বেশী হতে লাগল অকল্যাণ। দার্শনিক মতবাদ, যুগের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে এলেন ডারউইন, রুশো, হেগেল, এঙ্গেল, মার্কস্, লেনিন, গান্ধী, মাও প্রমুখ। সকলের লক্ষ্য কিন্তু সমাজের কল্যাণ করা। এতদিন যা করার জন্য ধর্ম প্রবর্তকগণ যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছেন,—এখন বর্তমান পরিভাষায় চিন্তানায়কগণ প্রকৃত-প্রস্তাবে তাই করতে এসেছেন। বিচিত্র এ দুনিয়ায় তবু কল্যাণ করার কাজ শেষ হয় নি, কোনকালে হবেও না!

যাহোক্, 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়' খৃষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। কবি জয়দেব পর্যন্ত সংস্কৃতে উচ্চকোটি সমাজের চিত্র প্রতিফলিত হয়ে আসছিল, চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগানে স্থান পেল নিম্নকোটি সমাজের চিত্র। তাতে স্থান পেল তাঁতি, মাঝি, ব্যাধ, ধুনুরী প্রভৃতি শ্রমজীবীর কথা। এমন কি তাতে তৎকালীন উচ্চকোটি বলতে ব্রাহ্মণ্যসমাজের প্রতি ব্যঙ্গের সুর ধ্বনিত হয়েছে দেখা যায়; অর্থাৎ দেবমহিমাকীর্তন করার ধারায় আঘাত এল,—মানবকে দেবতার আসনে বসিয়ে কীর্তন করার প্রবলতাও কমে এল,—বরং সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র সাহিত্যে স্থান পেয়ে তা সাধারণ মানুষের প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠল।

দেবতা নয়, সাধন-ভজন নয়, ভাববাদ নয়, একান্তভাবে 'মানুষ' এই কথাটি প্রথম ধ্বনিত হয়েছে ইসলামী সুফীবাদে। শত শত বছর ধরে পুষ্ট সংস্কারকে সজোরে আঘাত করে যেদিন ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয় হল, সেদিন সমগ্র পৃথিবীতে যে ধর্মীয় ভূমিকম্প হয়েছিল তার তুলনা নেই। জরথুস্ত্রীয় ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম, ইহুদী ধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রভৃতি সমস্ত ধর্মমত এমন সজোরে আঘাত খেল যে, তার ধাক্কা তাদের আর সামলানো সম্ভব হল না। সব ধর্মে সুফীমতের সরাসরি অনুপ্রবেশ ঘটল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দে পীর বায়োজিদ বিস্তাম রাজসুখ ত্যাগ করে আরব থেকে সর্বপ্রথম এদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে বয়ে আনেন সুফী আদর্শের ধারা।

পীর বায়োজিদ বিস্তামের পর আরো মুসলিম মিশনারি এদেশে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে পীর শাহ্‌জালাল, পীর গোরাচাঁদ, খাজা মৈনুদ্দীন চিস্তি,

নিজামুদ্দিন আউলিয়া প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা বললেন এবং আচরণের দ্বারা দেখিয়ে দিলেন যে,—ইসলাম কোনও জাতি বা শ্রেণীবিভাগ মানে না। সকল মানুষ সমান। এই উদার নীতিই ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি। ইসলামী সমাজে এ যতখানি কার্যকরীভাবে অনুসৃত হয়েছে—পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনও সমাজে তা দেখা যায় না।

ইসলাম ধর্ম যখন এদেশে প্রবেশ করে তখন এখানে কুসংস্কার ও আচারের গোঁড়ামি চরমে পৌঁছেছিল এবং এগুলিই হিন্দুর ধর্মমতে প্রাধান্যলাভ করেছিল। জাতিভেদ যেমন বেড়ে গেল, তেমনি বেড়ে গেল কৌলীন্য মর্যাদা এবং তা অসংখ্য শ্রেণীভেদের মধ্যে বিস্তৃত হল। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা, উচ্চশ্রেণীর বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের হাতে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করত;—মুসলমানদের হাতে হিন্দুর (উচ্চ বর্গের) পরাজয়ের ফলে তাদের অনেকে আনন্দিত হল এবং এমন একটা বিশ্বাস জন্মাল যে, হিন্দুর দেবতা বুঝি মুসলমানের রূপ ধরে এসেছে। মুসলমানধর্ম গ্রহণের ফলে হিন্দু সমাজে অবহেলিত সামান্য মেচ পার্বত্যজাতির একজন গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করল,—যাতে উৎসাহিত হয়ে ঐ শ্রেণীর লোকেরা দলে দলে ইসলামধর্ম গ্রহণ করল। এ তো গেল নিপীড়িত নিম্নবর্গের কথা। উচ্চবর্গের মধ্যেও নবীন মত ও প্রবীণ মতের তীব্র লড়াই চলছিল। ইসলাম দুর্ধর্ষ গতিতে এখানে প্রবেশ করার সাথে সাথে যুযুধান এই দুই পক্ষ আত্মসম্বিৎ ফিরে পেল। ইসলামের গতি রোধ করার ক্ষমতা রক্ষণশীলদের আদৌ ছিল না; সুসংগঠিত হয়ে তা প্রতিরোধ করার অবসরও তাঁরা পেলেন না। তাঁরা সংবদ্ধ যখন হলেন তখন মুসলিম রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাহিত্য সৃষ্টির কথা তখন আর তাঁদের মাথায় এল না। হতভম্ব হয়ে তাঁরা ভাবলেন, এ কী হল। এই সময়ে বাংলা সাহিত্যে শূন্যতার সূত্রপাত হয়। ১২০০ থেকে ১৩৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তা চলে; বরং বলা যায় যে তার ধাক্কা ১৪৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল।

যুগের প্রভাব পড়ে সাহিত্যে। সমাজের চিত্র ফুটে ওঠে সাহিত্যে। শূন্যতার যুগ যেহেতু অস্থিরতার যুগ সেহেতু এ যুগে সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে নি। তাই বঙ্গে শূন্যতার যুগের চিত্র দুষ্প্রাপ্য। সাহিত্য যাঁরা সৃষ্টি করবেন, সেই শিক্ষায় সভ্যতায় অগ্রসর উচ্চবর্গের লোক—ইসলামী আদর্শের বিপরীত সাহিত্য সৃষ্টি করতে স্বাভাবিকভাবেই নিরুৎসাহিত হলেন। তাছাড়া তৎকালে কবি-সাহিত্যিক বলতে প্রধানত রাজা-বাদশাহদের সভাপণ্ডিতগণকে বোঝাতো। রাজা-বাদশাহরা তাঁদের সভাপণ্ডিতগণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কবি-সাহিত্যিকগণ সেই পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য সৃষ্টি করতেন। তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য কবিগণের যথেষ্ট উৎসাহ থাকত। বাংলার শেষ হিন্দুরাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলেই তাঁর সভাকবি জয়দেব সংস্কৃতে 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেন। এ সময় শেখ পীর শাহ্ জালালের প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং গ্রন্থকার হলায়ুধ রচনা করেন সংস্কৃত হরকে 'সেক শুভোদয়া'। সেকশুভোদয়া হল, শেখ পীর শাহজালালের অলৌকিক কীর্তি-কলাপের কাহিনী।

লৌকিক দেব-দেবীকেন্দ্রিক সাহিত্যকর্ম বাদে এখানে দুটো ধারা লক্ষ্য করার বিষয়। প্রথমত দেখা যায় 'গীতগোবিন্দে' শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। মানব হলেও তাঁকে অতিমানব হিসেবে নিয়ে সাধারণ যুবক-যুবতীর প্রেম আদান-প্রদানের বিবরণ বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত 'সেক শুভোদয়ায়' মানব সেখ সাহেবের কিছু আশ্চর্য ক্ষমতার বিবরণসহ ঐশীপুররুষ হিসাবে নিয়ে তাঁর অলৌকিক কীর্তির কথা বিবৃত হয়েছে। এই দুটি ধারা মূলত সমগোত্রীয়। কারণ, রাজা তথা প্রজার নিকট ঐ সব মানব, সম্মানীয় বলে প্রতীত। এবং এমন সব সম্মানীয় মহান চরিত্র নিয়েই সাহিত্য রচিত হয়েছে। তাছাড়া আরো একটি ধারা দেখা যায় যাতে সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র নিয়ে রচিত হয়ে চলেছে সাহিত্য। যথা চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়। এবং তা সরাসরি একটি ধর্মীয় তাগিদে সৃষ্টি হয়েছে,—রাজপৃষ্ঠপোষকতায় নয়। চর্যাগীতিগুলি পণ্ডিতদের মতে লক্ষ্মণ সেনের আরো কয়েকশত বছর আগে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজগণের আমলেও কিছু কিছু রচিত হয়েছিল। তারপর প্রায় আড়াই শত বছর পর বাংলা সাহিত্যের বোধকরি দ্বিতীয় গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচিত হল। কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণের রচনা কারো মতে চতুর্দশ শতাব্দের মাঝামাঝি—কারো মতে পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি। গৌড়েশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতায় তা রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

কে সে গৌড়েশ্বর? রাজা গণেশ দনুজমর্দনদেব কি? সেটিই সম্ভব। সুতরাং কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার কাল পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। এর পর ১৪৭৩ থেকে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দ কালের মধ্যে মালাধর বসু ভাগবতের অনুবাদ করেন। রুকন্-উদ্দীন বরবক শাহ তাঁকে গুণরাজ উপাধি দেন। ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে এক হাব্‌সী ক্রীতদাস বাংলায় সিংহাসন দখল করে। হাবসীদের কু-শাসনে হিন্দু-মুসলমান আমীরগণ বিদ্রোহী হন এবং আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্ নামক এক যোগ্য ব্যক্তিকে বাংলার সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। তাঁর উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতা

ইতিহাস প্রসিদ্ধ। বিজয় গুপ্ত তাঁকে বলেছেন, —'সনাতন হুসেন শাহ্ নৃপতি তিলক।' যশোরাজ খান বলেছেন,—'সাহ্ হুসন জগতভূষণ।' কবীন্দ্র পরমেশ্বর বলেছেন,—'কৃষ্ণের অবতার'। চৈতন্যচরিতামৃত বলছে, তিনি চৈতন্যের ভক্ত ছিলেন।

এই সময় অর্থাৎ হুসেন শাহের রাজত্বকাল ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মহাভারত অনুবাদ ও মনসামঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। এরা পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতা বা দেবতাস্থানীয় চরিত্রকেন্দ্রিক। কিন্তু দেব-দেবীকে নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে সাহিত্য রচনা আর কতদিন চলতেপারে! মানুষকে দেবতা বানিয়েও বা গুণকীর্তন আর কতদিন করা যায়। জনজীবনকে গুরুত্ব না দিয়ে কেবল রাজার গুণকীর্তন কাহিনী আর কতদিন ভাল লাগে! তাই অন্তর থেকে তাগিদ এল সাহিত্যে মানুষকে মানুষরূপে প্রতিভাত করার জন্য। সেই মানবতা-বাদের জয়গানের কথা সুফীবাদে প্রথম সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তি-চরিত্র নিয়ে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির সূত্রপাত হয়। সেই প্রথম ব্যক্তি চরিত্রটি ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। বৃন্দাবন দাস আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের মধ্যেই 'চৈতন্য ভাগবত' রচনা করেন।

সুফীবাদ প্রভাবিত বৈষ্ণববাদ প্রচার করে চৈতন্যদেব হিন্দু সমাজে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। উচ্চকোটির অনেক হিন্দু তাঁকে গ্রহণ করলেন, অনেকে গ্রহণ করলেন না। কৃষ্ণপ্রেমে নদীয়া ডুবু-ডুবু হলেও সমগ্র বঙ্গের সর্বত্র সে বানের ধাক্কা পৌঁছায় নি। নিম্নকোটির হিন্দুরা চৈতন্যদেবকে মনে প্রাণে গ্রহণ করলেন, কারণ তিনি হরির নামে সকলকে এক পংক্তিতে সমমর্যাদায় স্থান দিয়ে বুকে টেনে নিলেন। নিম্নকোটির লোকদের মুসলিম হয়ে যাওয়ার প্রবণতা একমাত্র চৈতন্য-দেব যতখানি রোধ করতে পারলেন, ততখানি আর কেউ করতে পারলেন না। বলা বাহুল্য, চৈতন্যদেব অগ্রসর হয়ে না এলে বঙ্গদেশে হিন্দুগণকে বোধ করি আঙুলে গুণে হিসাব করা যেত অথবা আদৌ কেউ হিন্দু থাকতেন না। আগেই যাঁরা মুসলিম হয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যা তো সমগ্র বাঙালী সমাজে অর্ধেকেরও বেশী। তাঁদের মধ্যে যবন হরিদাস ব্যতীত আর কাউকে বোধ করি বৈষ্ণবধর্মে ধর্মান্তরিত হতে দেখা যায় নি। তাঁরা মুসলমানই রয়ে গেলেন আজন্ম-লালিত হিন্দুসংস্কারের অনেকখানি নিয়েও। চৈতন্য জীবনী-কাব্য তাঁদের প্রাণের কাব্য হ'ল না। কিছু মুসলিম, সুফীবাদসিক্ত বৈষ্ণব পদাবলী লিখেও, মুসলিমই রয়ে গেলেন।

গৌড়ের অধিকর্তা আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ যথেষ্ট সমাজ সচেতন এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। বৈষ্ণব-প্রেমের জোয়ার দেখে নিশ্চয় তিনি শঙ্কিত হয়েছিলেন। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে রাজক্ষমতা যদি টিকে থাকে ইসলাম ধর্ম প্রচার সহজ হবে। আর রাজক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে হলে স্থানীয় লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে বিরোধীতে পরিণত করা ঠিক নয়। এই কারণেই কি তিনি চৈতন্যদেবের ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন? চৈতন্যদেবও কি বুঝতে পারেন নি যে হুসেন শাহের নম্র মনোভাব গ্রহণের পশ্চাতে কূট অভিসন্দি বিদ্যমান! তবু চৈতন্যদেবের দৃঢ় প্রত্যয় যে,—

পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

বৈষ্ণবভক্তগণের মনোভাব,—

সর্ব অবতার সার গোরা অবতার।

চৈতন্যদেবকে নিয়ে চরিতকাব্য রচিত হ'ল কিন্তু হুসেন শাহ্কে নিয়ে হল না। রাজ্যের অধিকর্তা তিনি হতে পারেন,—রাজরোষ থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রজাগণ তাঁকে সম্মান দিতে এবং সম্মানিত করতে পারেন,—কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থল জয় করার সৌভাগ্য কয়জনের থাকে! হুসেন জীবনী তাই রচিত হয় নি। অন্যদিকে নিম্ন কোটির হিন্দু যাঁরা ইসলামধর্মে নবদীক্ষিত, যাঁরা অধিকাংশ অশিক্ষিত এবং নিরক্ষর, তাঁরা হুসেন শাহ্কে যত সম্মানই করুন কাব্যাদি রচনায় ছিলেন অসমর্থ। হুসেনশাহ্ রাজ্যের অধিকর্তা ছিলেন, ধর্মপ্রচারক নন। ধর্ম প্রচারকগণই বেশী জন-সংযোগ রাখতে সক্ষম হন। হুসেন শাহের তাই চৈতন্য-দেবের ন্যায় জনসংযোগ-সৌভাগ্য হয় নি। তাছাড়া ব্যক্তিপূজার ন্যায় ব্যক্তি-প্রশংসা ইসলাম বিরোধী। তাই কোন মুসলিম নিশ্চয় হুসেন শাহের গুণ-কীর্তনের জন্য 'হুসেন চরিতামৃত' রচনা করতে অগ্রসর হন নি। অপরপক্ষে আরবী-ফারসী ভাষা তখন ছিল রাজার ভাষা;—রাজ-আনুকূল্যলাভের পক্ষে বাংলা ভাষা অপেক্ষা আরবী-ফারসী ভাষার চর্চা বুদ্ধিমানের কাজ ছিল। অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা স্বাভাবিকভাবে আরবী-ফারসী চর্চায় অগ্রণী হলেন। কিন্তু নবদীক্ষিত মুসলিমগণের ততখানি ভাষাজ্ঞান ছিল না। ফলে মুসলিম সমাজের তরফ থেকে তখন কোন সাহিত্যিককে পাওয়া যায় নি। মুসলিম সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটল সপ্তদশ শতকে। আরাকানের রাজসভায় প্রথম তাঁদেরকে দেখা গেল। আবির্ভূত হলেন আলাওল প্রমুখ।

হুসেন শাহ্ এবং অন্যান্য অধস্তন মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক হিন্দুগণের প্রতি

উদারভাব পোষণ করার ফলে সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। উচ্চকোটির বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় মনের ব্যথা মনে রেখে কিছুটা শান্ত হলেন। তাঁরাও বুঝলেন যে হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি করে লাভবান হওয়ার কোন উপায় নেই। অতএব সহাবস্থানের হাত প্রসারিত করাই বাঞ্ছনীয়।

চিশতিয়া ও সুহরাবর্দিয়া তরীকার সুফীগণের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে হিন্দুর অদ্বৈতবাদ এবং কাদেরিয়া ও নক্সবন্দীয়া তরীকার দ্বৈতবাদের সঙ্গে হিন্দুর দ্বৈতবাদের মিল থাকায় উভয় ধর্মাদর্শের মধ্যে সমন্বয়ভাব গড়ে ওঠে। হিন্দুগণের সকলেই জন্মাগত সংস্কার ত্যাগ করতে না পারায় সেই সংস্কার নিয়েই তাঁরা মুসলিম থেকে যান। গুরুশিষ্য সম্পর্ক, গুরুভক্তি মনোবৃত্তি প্রভৃতি এদেশের মাটিতেই উদ্ভূত, যার জন্য পীর-দরবেশগণের প্রতি দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা করার মানসিকতা, হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ে সহায়তা করেছে।

হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে সমন্বয়ের একটা সুপরিকল্পিত রূপ পাওয়া যায় গৌড়াধিপতি আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সময় থেকে। এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ উপাস্য কোনো প্রতীক স্থির করার প্রবণতার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হতে থাকে।

কেহ বলেন, 'সত্যনারায়ণের কথায় যে আলা বাদশাহের কথা আছে তাকে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ বলে মনে করি। হোসেন শাহ হিন্দু-মুসলমানকে সমভাবে দেখতেন। তাঁর উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতা ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ। সম্ভবত হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁরই যত্নে সত্যনারায়ণের পূজা প্রবর্তিত হয়।' [দ্রষ্টব্যঃ বিশ্বকোষ—নগেন্দ্রনাথ বসু]।

কেহ বলেন, 'চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতেই যে হিন্দু-মুসলমান মিলনাত্মক মনোভাব গড়ে উঠতে আরম্ভ করে, তার আভাস রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণে' এইভাবে পাওয়া যায়,—

ব্রহ্মা হইল মহাম্মদ বিষ্ণু হইল পেকাম্বর
আদম হইল শূলপানি।
গণেশ হইল কাজি কার্তিক হইল গাজি
ফকির হইল মুনি॥ ইত্যাদি।

[দ্রষ্টব্যঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন]

এই মনোভাবের পরিণতিতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফয়জুল্লা লিখলেন,

…সেলাম করিব আগে পীর নিরঞ্জন।
মহম্মদ মস্তফা বন্দো আর পঞ্চাতন॥…
…হিন্দুর ঠাকুরগণে করি প্রণিপাত।
খানাকুলের বন্দিব ঠাকুর জগন্নাথ॥ ইত্যাদি।

[দ্রষ্টব্য : সত্যপীরের পাঁচালী—ফয়জুল্লা]।

উত্তরবঙ্গের প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার কৃষ্ণহরি দাস তাঁর সুবৃহৎ কাব্য বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুঁথি'তে ভনিতায় লিখলেন,—

এই পর্যন্ত হলাম ক্ষান্ত রাধাকান্ত স্মরি।
মুসলমানে বল আল্লা হিন্দুরা বল হরি॥…

অথবা, হিন্দুর দেবতা আমি মুসলমানের পীর।
যে যাহা কামনা করে তাহারে হাসিল॥

সত্যপীর বা সত্যপীরের পাঁচালীর (সত্যনারায়ণের পাঁচালী) উৎপত্তি কিভাবে হল সে সম্পর্কে আরো বক্তব্য পাওয়া যায়।

কেহ বলেন,—'সত্যপীর কোন মুসলমান পীর ছিলেন, পরে সমাজের স্বীকৃতির পর তিনি নারায়ণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সত্যনারায়নরূপে পরিচিত হন।' [দ্রষ্ট্যব্য : বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য]।

'কিংবদন্তী অনুসারে বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের কোন এক কন্যার গর্ভে সত্যপীর জন্মগ্রহণ করেছিলেন।' [দীনেশচন্দ্র সেন ও বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত লালা জয়নারায়ণ সেনের 'হরিলীলা' [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৮। রচনাকাল ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ]।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য, শঙ্কর আচার্য, দীনেশচন্দ্র সেন, রজনীকান্ত চক্রবর্তী প্রমুখ এ সম্পর্কে একই ভাবাত্মক বক্তব্য নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। তবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা আচার্য ডঃ সুকুমার সেনের বক্তব্য বিশেষ প্রনিধানযোগ্য,—'পীরের গাথা ও পীরের ব্রতকথা রীতিমতভাবে রচনা শুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দে। কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গলে বড়-খাঁ গাজীর কাহিনীতে পীর-গাথার এক পুরাতন নিদর্শন পাইয়াছি। তাহার পর শতাব্দের শেষ দুই দশক হইতে পীর-নারায়ণের একাত্ম মূর্তি—যাহা কৃষ্ণরাম দেখাইয়াছিলেন—তাহা পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে নূতন দেবতা সত্যনারায়ণ অথবা সত্যপীররূপে আবির্ভূত হইল।

('সত্য' এখানে আরবী 'হক্'-এর প্রতিশব্দ। সূফী গুরুরা ঈশ্বরকে এই নামে নির্দেশ করিতেন)। [বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস]।

কেহ বা কঠোর বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে লিখেছেন, 'এই উদার ধর্মমত আপনা-আপনি আসেনি। তুর্ক আক্রমণে যখন উচ্চবর্গ ক্ষমতাচ্যুত হয়ে এসে গেল নিম্নবর্গের কাছাকাছি, তখন উপরতলার হিন্দুদের মধ্যে ক্রমে নিচের তলার মানুষদের দেবতা এবং তাদের মাহাত্ম্যকেও স্বীকার করে নেবার প্রয়োজন হল। [দ্রষ্টব্য : বাঙ্গালা সাহিত্যের রূপরেখা, – গোপাল হালদার]।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দে এই মনোভাব গঠনের সূত্রপাত হওয়ায় সহজেই জানা যায় যে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ নিশ্চয় এর কিছু না কিছু স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, যদিও তিনি মনে মনে এর পক্ষপাতী ছিলেন না। হিন্দুরা সত্যপীরকে কতখানি দেবতার আসনে বসিয়েছিলেন তা জানা যায় এইভাবে যে মুসলিম সাহিত্যিকের পনেরো-বিশ গুণ বেশী সংখ্যক হিন্দু সাহিত্যিক 'সত্যপীর' কাব্য রচনা করেছিলেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মত যে রামেশ্বর ভট্টাচার্য, ভৈরব ঘটক, ফকিররাম দাস, বিকল চট্ট প্রমুখ উচ্চবর্গের হিন্দুরাই সর্বপ্রথমে সত্যপীর কাব্যের রচনা করেন অষ্টাদশ শতাব্দ কালের মধ্যে। এর পর পীর মাহাত্ম্য নিয়ে দেড় শতাধিক পীর-সাহিত্য (অত্র প্রবন্ধকারের রচিত "বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) রচিত হয়েছে।

বাংলা পীর-সাহিত্য উৎপত্তির এটাই সংক্ষিপ্ত কারণ ও বিবরণ।

শিবশম্ভু পালের কবিতা

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

আজ থেকে ঠিক দশ বছর আগে বেরিয়েছিল শিবশম্ভু পালের প্রথম কবিতার বই, 'ঘরে দূরে দিগন্তরেখায়।' তখনই তিনি জেনে গিয়েছিলেন, 'আসলে হৃদয় আর কাগজের মৌন সাদা সমতল ব্যেপে/প্রসারিত রক্তরেখাসমাকীর্ণ বেদী। / সেখানে সাজাতে হবে বিচিত্র রাত্রির শস্য, প্রেম, লক্ষ্যভেদী/স্পন্দিত শব্দের অস্ত্রে অমোঘ নিক্ষেপে।' বস্তুত, শিবশম্ভু পালের ওই প্রথম বইতেই তিনি সাজিয়েছিলেন বহু স্পন্দিত শব্দের অস্ত্র, যা সরাসরি লক্ষ্যভেদ করতে সমর্থ হয়েছিল। ছন্দে নিপুণ, প্রকরণে দক্ষ, শব্দে মনোযোগী শিবশম্ভু পাল ঘরোয়া অনুভূতিগুলিকে যে ক্রমশ দূরে ও দিগন্তরেখায় প্রসারিত করতে আগ্রহী, তার কিছু স্মরণীয় নমুনা সেই বইতেই রেখেছিলেন। বইটি থেকে শিবশম্ভুর ধারাবাহিক বিবর্তনের চিহ্নটি অনুসরণ করা কেবল দুঃসাধ্য ছিল, কেননা পূর্ববর্তী কবিতাবলীর এক বিপুল সম্ভার স্থানাভাবে হয়েছিল বর্জিত, এবং যেগুলি শেষ পর্যন্ত স্থান করে নিতে পেরেছিল – সেগুলিও সাজানো হয়েছিল ইচ্ছেমতন, পছন্দ-অনুসারে; কোনো সময়ক্রম অনুসরণ না-করে। তারপরেও চলে গেছে দশ-দশটি বছর। ইতিমধ্যে শিবশম্ভু ছোটবড়ো নানা পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতভাবে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। তার কিছু চোখে পড়েছে, বেশ-কিছুই হাতে পৌঁছয়নি। অন্য অনেকের ক্ষেত্রে এ-রকম ঘটনায় আক্ষেপের কিছু থাকত না, পত্র-পত্রিকায় যা চোখের সামনে হাজির হয়নি, গ্রন্থভুক্ত হয়ে অচিরেই তা উর্দি-পরা ওয়েটারের মতো হাজির হত। কিন্তু শিবশম্ভু পালের ক্ষেত্রে, দেখা যাচ্ছে, নিয়মিত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা বড়ো সুদূর। এত সুদূর যে বহু কবিতাই, ভয় হয়, সাময়িকীর পৃষ্ঠায় হারিয়ে

যেতে বাধ্য। গত পঁচিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে যিনি লিখছেন, তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা মাত্র এক। এ থেকে ধরেই নেওয়া যেতে পারে যে, পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ যখন প্রকাশিত হবে, তখন স্থান-সঙ্কুলানের খাতিরে বহু জরুরী লেখাকেও তাঁর পক্ষে বাতিল করে না দিয়ে উপায় থাকবে না। ফলে, তাঁর লেখার ধরন বা শব্দবোধ, মেজাজ. মানসিকতা, ভাবনাচিন্তার আদল কীভাবে পালটে গেল তা পুরোপুরি ধরা যাবে না। কতখানি পাল্টাল, তাও সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়বে কিনা সে সম্পর্কেও দ্বিধা থেকে যায়।

অথচ শিবশম্ভু পালের কবিতার মনস্ক পাঠকের কাছে এ দ্বিধা আক্ষেপে পরিণত হতে বাধ্য। তার প্রধান কারণ, তিনি নিয়মিতভাবে কবিতা লেখেন। আর নিয়মিত যিনি লেখেন, লেখার মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত হয় তাঁর দিনযাপনের যাবতীয় অভিজ্ঞতা। তাঁর পারিপার্শ্বিক, তাঁর অনুভব, সমসময় আর সমসমাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী—সব কিছুই ধরা পড়ে তাঁর লেখার মধ্যে। লেখাই তাঁর দিনপঞ্জী। ছোট-বড়, সামান্য ও জরুরী সব রকম ঘটনারই প্রতিক্রিয়া রূপান্তরিত হয় অক্ষরের ছাঁচে। সেই ছাঁচও একটু একটু করে বদলে যায় রোজ। সেই বদলটা চোখে-চোখে রাখলে সুবিধে, না রাখলে সংযোগবিহীনতা ঘটে যায়। সেটাই স্বাভাবিক। আর সেই কারণেই হঠাৎ শিবশম্ভু পালের একগুচ্ছ নতুন কবিতা হাতে চলে এলে, মধ্যবর্তী অবসরে কোথাও সংযোগ-বিহীনতা ঘটে গেছে, এমন আশঙ্কা হয়। আশঙ্কা যে কেন একেবারে অমূলক নয়, আগেই বলেছি। এবার দু'-একটা দৃষ্টান্ত দিই। যেমন, এই নতুন কবিতাগুচ্ছের 'ভৌতিক'। এখানে উপমান কে আর উপমেয় কে, এ-নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধাঁধা লেগে যায়। বুঝতে পারি, সাধারণ লজিক ধরে এ-কবিতায় এগোনো শক্ত। 'আঁধারেও ছায়া পড়া' যদি বা ভৌতিক লক্ষণ হয়, মেঘমুক্ত রাত্রির নিবিড়ে, পরিষ্কার ফোটা ধ্রুবতারা-খচিত আকাশের নিচে 'ক্যানিং স্ট্রীটের সরু রাস্তা থেকে ক্যাথিড্রাল রোডে' ছায়া পড়া নিশ্চিত স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু এই 'স্ববিরোধ' যে কবি আগেই চিনে ফেলেছেন, সেটা স্পষ্ট হয় শেষ স্তবকে পৌঁছে। তখনই মনে পড়ে যায় শিবশম্ভু পালের একটি স্বীকারোক্তিময় আত্মকথনের অংশ—"যে অসুখে আমি দুরারোগ্য রকম ভুগছি তার নাম পরস্পরবিরোধিতা, অনুস্কার্য দোটানার উদ্‌ভ্রান্তি।' (বেলা-অবেলা। ফাল্গুন-বৈশাখ, ১৩৭৭ : 'আত্মপরিচয়, আমারও!—শিবশম্ভু পাল) এক সত্তার সঙ্গে নিজেরই অপর সত্তার বিরোধ কবিতাটির মধ্যে থেকে, আস্তে-আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। 'একটি চতুর্থমাত্রিক রক্তপাত' কবিতায় 'ভূপৃষ্ঠে' অমোঘ নীল লুঙ্গি আর ইলেকট্রিক বিলের রিবেট' নিশ্চিত সূচিত করে মধ্যবিত্ত মানসিক পরিবেশ। তবু দ্বিতীয়টির শশব্যস্ততার মনোভাব নির্বিকার নীল লুঙ্গির' পাশে প্রয়োগ হিসেবে অমোঘ মনে হয় না। এমনই সুদূর লাগে 'ভৌতিক' কবিতার 'নর্মদা বেসেছে ভালো খরস্রোত অতি সাংঘাতিক' পংক্তিটি। 'হে অবিচুয়ারিস্‌ট' কবিতাটির ভঙ্গি যতটা সপ্রতিভ, বক্তব্য ততটা ঘন ও আন্তরিক বলে মনে হয় না। 'আরোপ' এর সঙ্গে 'ডানলপ' মিলেও কানের সায় নেই। সায় নেই 'বে-ওয়ারিশ' শব্দের মধ্যে মাত্রা-সম্প্রসারণের চেষ্টাতেও। 'সন্নিধান'-এর রচনাভঙ্গি যেমন আঁটসাঁট, বক্তব্যও তেমনই সংহত। প্রেমের অনুভূতি যে শিবশম্ভু পালের লেখায় বেশী তীব্র হয়ে ফুটে ওঠে তার প্রমাণ 'সন্নিধান'এও যেমন, তেমনই 'পুনরুত্থান'-এ। যার বেণীবন্ধে এবং সীমন্তের দর্পিত শাদায় আগুন ও উপেক্ষা, তার একমুষ্টি স্মৃতির দয়ায় উদ্ধার যে সহজ ছিল কত, এ-কথা হৃদয় নিংড়ে উচ্চারণ করা কিন্তু তেমন সহজ কাজ নয়। শিবশম্ভু অনায়াসে পেরেছেন। পেরেছেন এবং পারেন। তাই কবিতার পাঠককে তাঁর কাছে পা মুড়ে বসতেই হবে। বসতেই হয়। না হলে তাঁরও যে উদ্ধার নেই।

'পুনরুত্থান' প্রসঙ্গেও দুটি আপত্তির কথা বলি। 'এ আগুন তোমারই দান, উপেক্ষা তোমারই উপহার'—এই পংক্তিতে 'এ' নিঃসংশয়ে মাত্রাতিরিক্ত। ছন্দোনিপুণ কবির কাছে এ ভ্রান্তিবিলাস অপ্রত্যাশিত। 'পইতে পুড়িয়ে আমি'-তেও আটমাত্রা টেনে-বাড়ানো। বাংলা কবিতার ঝোঁক যখন মাত্রা সংহত করার দিকে, তখন প্রসারের এই চেষ্টায় সমর্থন জানানো শক্ত। পরীক্ষা যদি হয়, তাহলে বলব, এর থেকেও বড়ো পরীক্ষা শিবশম্ভু পালের কাছ থেকে প্রার্থনীয়। ছন্দের বাঁধা ছক থেকে তিনি কিন্তু একবারও বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেননি। অথচ তাঁর পক্ষেই সহজতর ছিল ছন্দ-ভাঙার ঝুঁকি নেবার, কেননা ছন্দ জেনেই ছন্দ ভাঙতে হয়। ছন্দে লেখার অক্ষমতা থেকে গদ্যে লেখার দিকে প্রবণতা বাংলা কবিতার বিস্তর ক্ষতি করে ফেলেছে। তার হাত থেকে বাঁচাতে পারে একমাত্র ছন্দ-কুশলীর বিদ্রোহই। শিবশম্ভু পাল ভেবে দেখবেন, সেই বিদ্রোহের তিনি অংশভাক্ হবেন কিনা।

পুনরুত্থান

কলকাতায় সঙ্কেতবৃক্ষ এখনও ইতস্তত আছে।
সেগুলো এড়িয়ে যাই। ইডেন কি ভিক্টোরিয়ার তরুচ্ছায়াগুলি
মহামতি অশোকের সদাবৃত থেকে দূরে, আমূল পৃথক;
এসব ছায়ার হাত আইনের চেয়েও দীর্ঘ, সরাসরি টেনে নিয়ে যাবে
শৃঙ্গারের দ্বৈতাদ্বৈতে ঠিক।

পইতে পুড়িয়ে আমি ব্রহ্মচারী, নিরাসক্ত ত্রিসন্ধ্যাযাপন
অভ্যাস করেছি, রোজ গঙ্গাজল ঢেলে দিই চিতাভস্মে, আমার পঞ্জরে
অনশনক্লিষ্ট কত লিরিকের আদুরে দুলাল
জ্বলে যায়, অথচ কতই
সহজ উদ্ধার ছিল একমুষ্ঠি স্মৃতির দয়ায়।
তোমাকেও দাহ করে নির্বিকার বেঁচে বর্তে হিন্দি ছবি দেখি!

এ আগুন তোমারই দান, উপেক্ষা তোমারই উপহার
ঢাকা ছিল বেণীবন্ধে সীমন্তের দর্পিত শাদার।
তুমিতো জানোনা ছিল দুপুরের খাঁ-খাঁ রাস্তা, কাঁধে হাত, হাতের মুঠোয়
যৌন-ছলে ক্যাডবেরি জতুগৃহ, থরেথরে সাজানো বারুদ।
তুমিতো জানোনা মূর্খ, শুধু একটু পান থেকে চুন
খসলেই উড়ে আসে স্ফুলিঙ্গের দানব হন্যতা।

বৃথা এত বাক্যব্যয়। হঠাৎ সেদিন তুমি বাস থেকে নেমে এলে কেন
যুক্তিহীন পারম্পর্যহীন
গন্তব্য বাতিল কর ফুঁদিয়ে উড়িয়ে ভস্ম, জনতাপ্রধান যাতায়াত
অথচ বিশ্বাস কর এই বাস নির্বাপিত চিতা ছাড়া তিনমাস ভাবিনি কিছুই!

একটি চতুর্মাত্রিক রক্তপাত

বন্ধুর আস্তানা আছে শহরেই, অথচ সেখানে
সীমান্তপ্রদেশঘন জলবায়ু, সিকো ঘড়ি, কাটপিস, বিলিতি মদের
থমথমে বৈরাগী গন্ধ। ওইখানে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে কয়েকজন

ঘরে বসে ঘুরে আসে পাহাড় পেরিয়ে, ওরা অভিধান ছিঁড়ে ফেলে, তার
উড়ন্ত পৃষ্ঠায় ছাপা আরাম শব্দের অর্থ আমি যেটা রাত জেগেজেগে
মুখস্থ করার পর বাড়ি ফিরি ঠিক সাড়ে নটা।
ভাঙে না চশমার লেনস, মুর্গির মাংসে রুচি থাকেনা, একদিন
চপারের গায়ে লাল থকথকে রক্ত দেখে কেঁপে উঠে বমি···
আমি খুবই রক্তভীতু; পালকের কীর্ণ অবশেষ
যুযুধান হেলমেট, শেষচেষ্টা, দণ্ডবিধি, তরতাজা পত্যের স্প্লিন্টার
ভয়ের অনেক নিচে, ভূপৃষ্ঠে অমোঘ নীল লুঙ্গি আর ইলেকট্রিক বিলের রিবেট।

তারপর কোনো কোনো মধ্যযামে সীমান্তের মনস্টারি থেকে
বিধর্মী হাওয়ার দল ঢুকে পড়ে পাঁজরায়, অবাস্তব চাঁদের দৌলতে
প্রশাসনযন্ত্রগুলো ভেঙেচুরে তৈরি করে ঝকঝকে তুষারকণার
অন্তরীক্ষবিলাসিতা; খুব শীত করে;
তাসার উন্মাদ বোলে অবিরত অন্তরোলে কান ফেটে যায়;
আমরা প্রাক্তন নই, আমরা প্রাক্তন নই, চলে এস আমাদের দামাল হোস্টেলে।
ঘেমে উঠি, ঘুম ভেঙ্গে যায়।

যতক্ষণ শুয়ে থাকি ফিরেও দেখিনা পাশে থাঁথাঁ করে উন্মুক্ত ব্লাউজ
বরং দুচোখ ভরে চেয়ে দেখি আঁধারের জোটবদ্ধ বিশাল প্রতিভা
ক্রমেক্রমে ঘিরে ফেলে, চেপে ধরে কণ্ঠনালী – কেউ নয়, বন্ধ্যা অনুতাপ।
তারপর উঠে পড়ি। এবং সময় পেলে যাবতীয় রক্তভয় শুধু
অক্ষরবৃত্তের ছাঁচে ঢালাই করেছি, জানি 'রক্তপাত' শব্দে দোষ নেই,
গুণে দ্যাখো, চারমাত্রা আছে।

ভৌতিক

আঁধারেও ছায়া পড়ে তোমাদের, এত বেশি সচল শরীর
হাঁটার ক্ষমতা নেই আমাদের, শূন্যভুক, এতই গরিব।

আমাদের থেকে যায় উন্মাদ রোগাটে নৌকো, কুয়াশায় ঢাকে চারদিক;
নর্মদা বেসেছে ভালো খরস্রোত অতি সাংঘাতিক।

তোমাদের ছায়া পড়ে ক্যানিং স্ট্রিটের সরু রাস্তা থেকে ক্যাথিড্রাল রোডে
কেননা নিবিড় রাত্রি মেঘমুক্ত, ধ্রুবতারা পরিষ্কার ফোটে।

এসব জেনেছি আমরা, ছায়াবিশেষজ্ঞ, অভিশাপ :
খুঁজেছি কোথায় কে বা কারা লেখে অবকাশরঞ্জনের খশড়া প্রস্তাব।

আমাদের ছায়া নেই, ক্রমাগত দেহ থেকে খসে যায় দেহ
হাঁটার ক্ষমতাগুলো প্রকাশ্য রোদেও হেসে চুরি করে চলে যায় কে ও ?

ওকে চিনি, স্ববিরোধ ; শুধুই বসিয়ে রাখে মাঝখানে, ছুটি
শুধু আছে কুয়াশায়, ভাসমান পাটাতনে কিছু পদ্য, কিছু কাটাকুটি !

হে অবিচুয়ারিস্ট

দেশলাই ফেরত নিতে ভুলি না কখনো
রাস্তা পেরোবার আগে ডাইনে-বাঁয়ে বেসামাল তরুণ কবির
বিভাসে পূরবী
মেশানো সখের প্রাণ দেখে দিয়ে পিছোনো এগোনো

আমার চর্চিত শ্রান্তি। সুতরাং মাঝরাতে আঁধার দখল করে
স্ত্রীর গায়ে করি না আরোপ
পরস্ত্রীর বিম্বাধর ; আটঘণ্টা বেশ
ঘুমোই, কাগজে যেন এই মর্মে জানিয়েছে নবতর ট্রাফিকনির্দেশ
প্রচারকুশলী ডানলপ।

দাঁড়াও, আর একটু আছে। দেশলাই বে-ওয়ারিশ
প্রায়শই পড়ে থাকে, বউ-বাচ্চা কেউ নেই, রাজপথে শুধু কতিপয়
বেসামাল কবির অব্যয়
ধ্বনিত দুঃখের সঙ্গে আমার উদোম সখ্য জামাটামা খুললেই,
এ-ও জেনো, অবিচুয়ারিস্ট।

সন্নিধান

ভালো লেগেছিল খুব গতরাত্রে কাছাকাছি বসে
প্রবাসের মেঘচ্ছায়া স্পর্শ করে বহুদূর হাঁটা।
দেখা দিল অকুণ্ঠিত আমাদের নিজস্ব আঘাটা
পাশ দিয়ে সমর্থন বয়েছিল স্রোতের হরষে···
সে কি কোন সাধারণ রাত্রি ছিল অথবা দিবসে
পিছুটান ? মেঘচ্ছায়া স্পর্শ করে বহুদূর হাঁটা
তোমার শাড়িতে লগ্ন অনেক প্রতীকী চোরকাঁটা
প্রসঙ্গবিচ্যুত গান আসে : কে গো অন্তরতর সে।

প্রসঙ্গবিচ্যুত বটে। অন্যথায় থেকে যায় চাঁদ
নিছক আকাশে কিংবা আধুনিক বাংলা গানে বাসি
এবং তোমার জন্যে গৃহগাত্র। কেন ফের আসি
হাস্যকর অছিলায় দীর্ঘদিন পর অকস্মাৎ ;
তুমি ঠিকই শুনতে পাও ত্রিভুবনভেদী আর্তনাদ
আমার অন্তর থেকে ; কেন আজও উপবনবাসী !

ব্যক্তিগত রচনা

কী পড়ি

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় কৃত্তিবাসে লিখেছিলেন, সিরাজ গিলগামেশ পড়ে। কথাটা উপহাসজনিত হতে পারে, কিংবা যারা গলার ভেতর ঢাকের মতো 'পড়াশোনা' উচ্চারণ করে তাদের পশ্চাদ্দেশে শ্যামলের লাথি মারার ইচ্ছাও হতে পারে। কোনো-কোনো বন্ধুজন আমাকে গিলগামেশ বলে ডেকেও থাকেন। তবে এজন্যে আমার দুঃখটুঃখ হয় না, কিংবা প্রথাসিদ্ধ করুণাবশতঃ 'ঈশ্বর! ঈশ্বর!' এরা কী করছে জানে না' (এই আর্তনাদ যীশুর নয়, জরথুস্ট্রেরা) বলেও অহমিকাময় অভিমান প্রশমিত করি না। ক'বছর আগে হঠকারী চাপল্যে 'দেশ' পত্রিকায় সুমেরীয় অমৃতাভিলাষী পুরুষ গিলগামেশের বৃত্তান্ত লিখে ফেলেছিলাম। এ বোকামি আর নয়। আসলে হয়েছিল কী, অমৃতের বাসনার একান্ত দৃষ্টান্ত যে গার্গী নন এবং এই ব্যাপারটা আরও—আরও পুরনো এবং হোমো-সেপিয়েনদের একটি অতি-প্রিমিটিভ বোধ - এসব কথা বলার লোভ সম্বরণ করতে পারিনি। লক্ষ-লক্ষ বালক-বালিকা গাল ফুলিয়ে 'এস হে আর্য এস অনার্য' পড়ে। লাছল এলাকার বৃত্তান্তে যুবতীর ছবির ক্যাপশানে কী অনায়াসে লেখা হয় 'আর্য-মঙ্গোল রক্তের সংমিশ্রণ' !! মোক্ষমূলার এখনও বিস্তর ভারতীয়ের জাতি-মোক্ষের মূলাধার হয়ে বিরাজ করেন। তাই নিয়ে নীরদ চৌধুরী কেতাবও লেখেন। সম্প্রতি যীশুকে নিয়েও তুমুল হয়ে গেল! শ্রীমতী কেতকী অতশত না বুঝে কেউটের লেজ ধরতে গিয়েছিলেন। তো এমন সব বিবিধ ব্যাপার যতই ঘটুক, শঙ্করীবৎ ফরফর করার কোনো মানে হয় না। আমি গিলগামেশ নিয়েই আছি। কারণ গিলগামেশ ছিলেন অমৃত-সন্ধানী।

একবার মতিনন্দীর বাড়ি মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণে গিয়ে দক্ষিণাস্বরূপ (আমরা গুরুবংশ) এ্যালান ডানডেস সম্পাদিত 'দি স্টাডি অফ ফোকলোর' বইটি পেয়ে যাই। মোটা ইংরেজি বই। ওজনদার। ইজ্জত বাড়ানো গম্ভীর কভার। বেশ কয়েক বছর আলমারিতে তোলা ছিল। তখন যুদ্ধ সংক্রান্ত বই যোগাড় করছি আর উন্মাদ হয়ে পড়ছি। তারপর আবিষ্কার করলাম যুদ্ধ দেখতে দেখতে অজ্ঞাতসারে প্রাগৈতিহাসিক সমাজে গিয়ে পৌঁছেছি। তখন নৃতত্ত্ব-প্রত্নতত্ত্বের চেয়ে রোমাঞ্চকর পাঠ্য আর কিছু নেই জেনে শেষ পর্যন্ত গিলগামেশকে খুঁজে বের করলাম। কিন্তু সেই সূত্রে কম্পারেটিভ মিথলজির মধ্যে না ঢুকলে জানতেই পারতাম না, মতির উপহৃত বইটি কত মূল্যবান। জানতেই পারতাম না বাইবেলের প্রচুর এপিসোডের উৎস কোথায়। যেমন নোয়ার প্লাবন কাহিনীর উৎস একান্তভাবে সুমেরীয় মিথ অর্থাৎ সেই গিলগামেশ। আর সুমেরীয় প্লাবন মিথও অনন্য নয়। এ যাবৎ নানাদেশ চুঁড়ে এই মিথ পাওয়া গেছে। শুধু ফরমোসা, দক্ষিণচীন, উত্তর-পূর্ব এশিয়া ও মালয়েশিয়াতেই একানটি। ভারতীয় মিথটিও প্রচণ্ড উল্লেখ্য। এসব অনুসন্ধান গোয়েন্দা কাহিনীর চেয়েও রগরগে।

কম্পারেটিভ মিথলজি চর্চার শিহরণ, স্বেদ ও পুলক যৌনতার তুল্যমূল্য। তো জলের কথায় এসে আরেক যোগসূত্র মনে পড়ে গেল। কোনো এক শরৎকালের সকালে সন্তোষ কুমার ঘোষ ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলিপুর চিড়িয়াখানার পানশালায় লেমনস্কিন্ধ জিনে চুমুক দিতে দিতে সমুদ্রের কথা বলছিলাম। প্রথম সমুদ্র দেখে কার কী অনুভূতি জেগেছিল। সুনীল একটি বিস্ময়কর বাক্য বললেন। প্রথম সমুদ্র দেখে সেই লোকটির কথা তাঁর মনে হয়েছিল, সর্বপ্রথম যার মাথায় জলযানের কথা আসে! অর্থাৎ এই বিশাল জল পেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, এমন ভাবনা জাগার সঙ্গে সঙ্গেই বস্তুত সভ্যতার সূচনা ঘটেছিল।

কিন্তু কী মারাত্মক এই বাক্য! কী অমোঘ দৈববার্তার মতো আলোড়নকারী! আমাদের বাল্যকাল থেকে শেখানো হয় এক বর্বর জঙ্গী পশুপালক ও স্থলচর জন-গোষ্ঠির গুণগান। তারাই নাকি সভ্যতা বহন করে এনেছিল অশ্ববাহিত রথে। অথচ তারও কত আগে-আগে পৃথিবীজুড়ে যথার্থ সভ্যতার অস্তিত্ব প্রমাণিত। এবং এও প্রমাণিত, অশ্ব নয়, জলযানই প্রথম সভ্যতাবহনকারী। সব দেশের পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বে তাই জলের ভূমিকাটি শ্রেষ্ঠতম।

জলের টানে ভেসে গিয়েই আবিষ্কার করেছি, ইউরোপে আঠারো শতকের শিল্প-সাহিত্যে বাস্তববাদের দুই ঠ্যাঙের ফাঁক গলিয়ে প্রকৃতিবাদ কোথা থেকে এসে ঢুকে

পড়েছিল। হেমিংস সম্পাদিত 'দি এজ অফ রিয়্যালিজম' নিবন্ধগুচ্ছে এই হঠকারী গোলমেলে ব্যাপারটা বুঝিনি, লেখা ও বিশ্লেষণগুলো যত চমৎকার হোক্। হঠাৎ একটা বই হাতে এল। এ্যালান মোরহেডের 'দি ফেটাল ইমপ্যাষ্ট।' বুদ্ধুমার ঘটে গেল। পলিনেশীয় এলাকায় প্রথম যায় ফরাসী জাহাজ। আবিষ্কৃত হয় মর্তে বাইবেলী স্বর্গের প্রতিচ্ছবি। আদম ও ইভ। ফরাসী নাবিকরা প্রকৃতিনন্দিনী ইভদের নিঃসঙ্কোচ লাভমেকিংয়ের আমন্ত্রণে মেতে ওঠে। সেই সুসমাচার পৌঁছায় ইউরোপে। আরপর ক্রমে ক্রমে হাজির হন টমাস কুক, হেরমান মেলভিলে, পল গগ্যাঁ। অ-ক পরে ডারউইন। মেলভিলের পঞ্চাশ বছর পরে গগ্যাঁ যান। এক তাহিতীয় ইভকে বিয়ে করেন। কাচ্চাবাচ্চা জন্মায়। মারা যান হিভোওয়া দ্বীপে। বন্দুকের বাঁট খোদাই করে ছবি এঁকেছিলেন। থর হেয়ারডাল প্রথম যৌবনে ফাতু-হিভা দ্বীপে হনিমুনে যাওয়ার পর সেই বন্দুক উদ্ধার করেন। কিন্তু মজার কথা, সেই অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝিতেই ইউরোপ জুড়ে ছি-ছিক্কার উঠেছিল—ধিক এই সভ্যতা! সব গলেপচে গেছে। অতএব ফিরে চলো প্রকৃতিতে। সহিত্যে-শিল্পে প্রকৃতির জয়গান শুরু হয়েছিল।

ব্যাপারটা সম্পূর্ণ সেমেটিক ধর্মবিশ্বাসের ওপর দাঁড় করানো। তাহিতি দ্বীপের প্রায় নগ্ন এবং সর্বদা লাভমেকিংয়ে তৎপর রমণী (এবং পুরুষও) শিল্প-সাহিত্যে প্রকৃতিবাদের মূল প্রেরণা তো বটেই, কিন্তু এর কাঠামোতে ছিল বাইবেলী স্বর্গতত্ত্ব। সাম্প্রতিক যুগেও ওই শ্বেতকায় জাতির নতুন প্রজন্ম ব্যাক টু নেচার নিয়ে মেতেছে —যার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি কিছু এদেশেও শোনা যাচ্ছে। অবশ্য এ সেই চুল-ছাগলদাড়িক্ষয়া পাতলুন ফ্যাসানের অনুকরণের মতোই। আরে বাবা, আমরা তো প্রকৃতিতেই আছি। একেবারে প্রিমিটিভ দশায়। গত বন্যায় কী ঘটল?

লরেন্স হোন, কিংবা প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযাত্রী হেয়ারডাল হোন, এই ব্যাক টু নেচারের মধ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসই অবচেতন প্রেরণা। আমার কাছে ব্যাক টু দি হিউম্যান ব্যাকগ্রাউণ্ড জরুরী।

লক্ষ্য করেছি, নৃতত্ত্ব-পুরাতত্ত্বের এলাকার সীমা নেই। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে। সম্প্রতি পড়া বই এ্যালান মোরহেডের 'দি হোয়াইট নীল'ও আফ্রিকার ব্যাপারে অসংখ্য উপাদান যুগিয়েছে। সেদিন ফুটপাতে হঠাৎ একটা বই পেয়ে যাই 'দি ফরেস্ট পিপল।' আফ্রিকার পিগমিদের বৃত্তান্ত। লেখক কলিন এম টার্নবুল। দু'বছর ভারতে ছিলেন। মা আনন্দময়ীর শিষ্য। বইটি সতের বছর আগে প্রকাশিত। পিগমিদের মধ্যে অনেককাল থেকে বইটি লিখেছেন

ভদ্রলোক। কিন্তু নৃতত্ত্বের জন্যে একটি সরেস উপাদান। এভাবেই ফুটপাতে পেয়ে গিয়েছিলাম রেড ইনডিয়ানদের একটি গোষ্ঠি 'জিভারো'দের বৃত্তান্ত। পরে দক্ষিণ আমেরিকার পুরনো সভ্যতা মায়া-ইনকা-আজটেক সম্পর্কিত পড়াশোনায় দারুণ কাজে লাগল? এখনও পড়ছি এ্যালডেন মেসনের 'দি এ্যানসিয়েণ্ট সিভিলাইজেশন অফ পেরু।' এমনকী আমার প্রিয়তম জিম করবেটও নৃতত্ত্বের বিস্তর সূত্র পাইয়ে দিতে সাহায্য করেছেন। সম্প্রতি কিনেছি 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ফেয়ারিজ।' বিগিতী পরীদের বৃত্তান্ত। হায়, এদেশে কত পরী মাঠে বুড়ি হতে হতে মারা গেল! অরণ্যদেবের হাতেই। পরী নিয়ে বাংলা বিশ্বকোষ? ভাবাই যায় না। ভূত নিয়েও অসংখ্য বিলিতী কেতাব আছে। ভূত একটি ঐতিহাসিক মূল্যবান বিষয়। এনসাইক্লোপিডিয়া অফ মিথলজিতেই কত বিচিত্র চরিত্রের ভূতের কথা আছে। সমাজ বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের পক্ষেও ভূত একটা জরুরী ব্যাপার। দেশী গবেষকদের এ নিয়ে মাথাব্যাথা কম।

পুরাতত্ত্ব, বিশেষ করে নৃতত্ত্বের একটা টেকনিকাল দিক আছে। বিরাট একাডেমিক কেতা আছে। আছে প্রাতিষ্ঠানিক প্রথাসিদ্ধ ধ্যানধারণা। আমার কাছে এগুলো জরুরী নয়। কিছু টার্ম অবশ্য না জানলেই নয়। সেগুলো ভয়াবহ কিছু না। এবং সেগুলোই জানতে সাহায্য করে, তথাকথিত কোনো আর্য খুলি কোথাও পাওয়া যায়নি। কাজেই কোনো যুবতীর ছবির ক্যাপশানে আর্য-মঙ্গোল রক্তের সংমিশ্রণ বাক্যটি উদ্ভট। যে অর্থে ককেশীয় বা মঙ্গোলীয় বা অস্ট্রালয়েড একটি জাতি, সে অর্থে আর্য নামে কোনো জাতিই ছিলনা। ওটা একটা কালচার বলা যায়। "কারণ-১৪' পরীক্ষার সুযোগ দেয়নি আর্যরা।

আসলে আমি তথ্যসংগ্রহ করে নিই একাডেমিশিয়ান পণ্ডিতদের কাঁধে চেপে। তাঁদের বিস্তর সুবিধাসুযোগ আছে তথ্য সংগ্রহের। আমার মতো এমেচারের তা নেই। আমি তাঁদের কারুর মতামতে কর্ণপাত করিনা। কী দরকার? আমার চাই তথ্য। আমার পক্ষে প্রশান্ত বা এ্যাটলান্টিক মহাসাগরে পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়। অতএব থর হেয়ারডাল সহায়। বার্টন, লিভিংস্টোন, স্ট্যানলি, টমাস কুক, মিচেল হেজেস-রা আমার বন্ধু। ব্রাজিল যাওয়ার কপাল করে আসিনি! এতএব সিয়েমেল প্রমুখ অভিযাত্রীদের কাছে খবর নেওয়া ছাড়া উপায় কী? এ ভাবেই জন মার্শাল, রাখাল দাস, গর্ডন চাইল্ড, মার্টিমার হুইলার থেকে শুরু করে কোশাম্বীপ্রমুখ সিন্ধুসভ্যতার তথ্য

যোগান দেন। ফ্রেজার, জর্জ টমসন, শ্রীমতী হ্যারিসন, ক্রিস্টফার কণ্ডওয়েল, বার্নাল, ই. ও. জেমন, পিগট প্রমুখের বিশ্লেষণ চুঁড়ে নিজের মতামত দাঁড় করাই। আর্নস্ট্ ডলোফার 'দি ভয়েসেস ইন দি স্টোনে'র পাতায় সিন্ধুলিপির অজস্র মূলচিহ্নের পাশাপাশি ইণ্টার আইল্যাণ্ডের লিপির ছবি ছেপে দেখিয়ে দেন, এ মিল বিস্ময়কর। নিছক আকস্মিক? প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্ব অচলায়তন। সাজানো সংসার ভাঙতে কে চায়? দুনিয়া জুড়ে বংশপরম্পরা শিক্ষাশালায় সেসব মুখস্থ করানো হচ্ছে। আর ওই রিলিজিয়ন-ধর্ম! বড় বিপজ্জনক ও স্পর্শকাতর জিনিস। দেশ পত্রিকায় যীশু নিয়ে কিছু চিঠি বেরুল। একটা চিঠি বাদে সব হাস্যকর প্রাতিষ্ঠানিক হিড়িক। খ্রীস্টে বিশ্বাসী থিওলজিস্টরাও পাদ্রীদের গাঁট্টা খেয়েছেন বারংবার। সত্যি বলতে কী, একজিস্টেন্সিয়ালিজম নামক দার্শনিক দ্রব্যটিও খ্রীস্টীয় থিওলজিস্টদের প্রাথমিক উপহার; সেই 'স্বর্গ হইতে পতনে' এর বীজ নিহিত। (হেইদেগার উল্লেখ্য) দেখে অদ্ভুত লাগল, যীশু-আলোচকরা কেউই মৃত-সাগরের পুঁথিগুলো নিয়ে বেশি এগোলেন না। যীশু-রহস্যের প্রচুর সূত্র মৃত-সাগরের কুমরান এবং সংলগ্ন এলাকায় আবিষ্কৃত হয়েছে। এখনও হচ্ছে ক্রমাগত। কুমরানী এক এসেনিস্ট গোষ্ঠির ইহুদী যাজকদের বৃত্তান্ত এবং বাইবেল কেতাবটি গ্রন্থনার ইতিহাস না জানা থকেলে সবরকম আস্ফালন হাস্যকর। এ বিষয়ে বিশেষ পাঠ্য জন এ্যালারগোর 'দি ডেড সি স্ক্রলস।' ইনি নিজেই কুমরানী পুঁথির অন্যতম পাঠোদ্ধারকারী এবং নিরপেক্ষ গবেষক। বইটি আগাথা ক্রিস্টি বা জর্জ সিমেন'র চেয়েও আকর্ষক।

দুই

গ্রন্থপঞ্জীর সন্নিবেশ কেলোর কীর্তি হয়। 'কী পড়ি' বলতে তাই মতামত বা ধারণা এসেই যাচ্ছে। 'বিশ্বস্তসূত্রে' পড়ার কথা শুনলাম এই পত্রিকাতেই। সন্দীপন কুশলী বক্তা বরাবর। একদা আমার লেখা একটা গল্প প্রসঙ্গে তিনি গুণ্টার গ্রাস উচ্চারণ করেন। গল্প ও উপন্যাসটুপন্যাসের আমি কোনোকালেই বিশেষ ভক্ত নই। পরে গুণ্টার গ্রাসের একটি টিনের ড্রামের ভেতর ঢুকে পড়ি এবং একদা ভিউক রেস্তোরাঁয় এক অপরাহ্নে শীর্ষেন্দু ও সন্দীপনের সঙ্গে চায়ে চুমুক দিতে দিতে লক্ষ্য করি সন্দীপন শুধুমাত্র নৌকোর তলায় ঢুকে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পালিয়ে এসেছেন এবং বললেন, গোটাটা পড়ার কী দরকার? ওতেই সব বোঝা যায়। অর্থাৎ 'আণ্ডার দি র‍্যাকুট' চ্যাপ্টারেই।

ঠিকই তো। বুদ্ধিমান লোক হাঁড়ির পুরো খবর পান একটা ভাত টিপে। সুতরাং এটা সন্দীপনের নিন্দা নয়, আমার একটি ধারণা প্রকাশ। বিস্তর একাডেমিশিয়ান বাংলাসাহিত্য থোসা সমেত উদরস্থ করে পর্বতপ্রমাণ মলত্যাগ করেছেন এবং তা পরীক্ষার জন্যে কাঠি দিয়ে ঘাঁটা ছাড়া আর কী কাজে লাগে? বড় জোর শীতের সব্জি ফলে এবং পুনঃ মলে পরিণত হয়। এক ভদ্রলোক মার্কসবাদ গুলে খেয়ে প্রমাণ করেছিলেন, ভারতে ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে গেছে। ভাবা যায়!

অকপটে জানাচ্ছি, গল্প-উপন্যাস এখন কদাচিৎ পড়ি। 'বিশ্বস্তসূত্রে' কথাটি কী তাৎপর্যপূর্ণ! কোনোমতে ইংরেজিটা-বাংলাটা বুঝতে পারি। কাজেই টমাস মানের ডেথ ইন ভেনিস কিংবা বালজাকের ওল্ড গইরো ইংরেজিতে পড়া মানে বিশ্বস্তসূত্রে পড়া ছাড়া আর কী হতে পারে?

অতএব 'বিশ্বস্তসূত্রে' সাহিত্য পড়ার পরামর্শ আমার মতো পাঠকের পক্ষে মূল্যবান। নয়তো কী? অনুবাদে সাহিত্যপাঠ ব্যাপারটা তো তাই। এখন টেবিলে আমার সাম্প্রতিক প্রিয় কবি রবার্ট লোয়েলের একগুচ্ছ অনুবাদকবিতার বই রয়েছে। সোজাসুজি নাম রেখেছেন 'ইমিটেশানস'। তাই-ই তো! কবিতার অনুবাদ হয়? পাস্তেরনাক যাই বলুন। লোয়েল হোমার থেকে পাস্তেরনাক অব্দি কবিতা ইংরেজিতে সাজিয়ে বলেছেন, 'ওয়ান ভয়েস থ্ মেনি পার্সোনালিটিজ' এবং এ সবই 'সেপারেট ফ্রম ইটস সোর্সেস।' এর পর আর বুদ্ধদেব বসুর বোদলেয়ার অনুবাদ দেখে আদৌ ভ্রূকুঞ্চনের পক্ষপাতী নই। 'ফ্লাওয়ার্স অফ এভিলের' রয় ক্যাম্পবেল অনূদিত ইংরিজী ভার্সানের পাশাপাশি লোয়েলের ভার্সান পড়ে দেখেছি। লোয়েল তুলনাহীন।

হ্যাঁ, কবিতা বরাবর পড়ি। কবিতায় জীবনের রহস্যময়তা আছে, যা পুরাতত্ত্বের রহস্যময়তারই সমার্থক। যে ইতিহাস পড়ে, সে কবিতা না পড়লে সেই মলত্যাগঘটিত ব্যাপার ঘটবে। আর কবিরা ছাড়া কেই বা তেমন মহান দার্শনিক? তথাকথিত কেতাবী দর্শনের মৃত্যু ঘটেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে। সার্ত্র একটা পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করেন। তার অপাঠ্য কিংবা দুষ্পাঠ্য বৃহৎ কেতাব 'বিইং এ্যাণ্ড্ নাথিংনেস' আলমারিতে তুলে রেখেছি। বরং আধুনিক বিজ্ঞানই এবার যথার্থ দর্শনের দিকে মানুষের বোধকে আকর্ষণ করছে। অথচ বিশুদ্ধ গণিতে না জ্ঞান থাকলে পরম সত্তার অনুসন্ধান নিষ্ফল।

কিন্তু সতর্কতা দরকার। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইদানিং বিজ্ঞানের পাশে

তুমুল অপবিজ্ঞান জড়ো করছে। বিস্তর গুজব গজিয়ে উঠছে। যেমন 'ক্লোনিং'। ডেভিড রোতরিক নামে জনৈক লেখক 'ইন হিজ ইমেজ' লিখে মস্তো দাবি করেছেন। এমন কেলোর কীর্তি ক্রমশ বিস্তর দেখা যাবে। একসময় ডেসমণ্ড মরিস নামে এক ভদ্রলোক 'দি নেকেড এপ' লিখে হৈ চৈ বাধিয়েছিলেন গড্ডলপ্রবাহে সে এক রোমহর্ষক ব্যাপার ঘটেছিল। দানিকেন নামে এক ফিকশন-লেখকও তাই করছেন। তবে স্রেফ বিজ্ঞানের আওতা থেকে ওইসব গুজব ছড়ায় কী ভাবে, তার নমুনা কিছুকাল আগে বিকিনিতে সম্প্রচারিত নোবেল পুরস্কার পাওয়া আণবিক জীববিজ্ঞানী জাঁক মোঁদের ঘোষণা "মানুষ একান্তভাবে যন্ত্র এবং গবেষণাগারে উৎপাদনযোগ্য বস্তু।" এর সঙ্গে আচরণবাদীদের গলাও শোনা যাচ্ছে। এ সবের প্রতিবাদ না হচ্ছে, এমন নয়। কিছুদিন আগেই পড়লাম ডঃ জন লুইসের 'দি ইউনিকনেস অফ ম্যান।' অসাধারণ বই। লুইসরা বলছেন, সাবধান। এ হচ্ছে এক মারাত্মক মতবাদ 'নাথিং বাট'-তত্ত্ব (অর্থাৎ মানুষ নাথিং বাট মেসিন) একে বলা উচিত রিডাকশানিজম—সংকোচনবাদ। মানুষকে খাটো করার সাংঘাতিক অপচেষ্টা। বিজ্ঞানের নামে এসব যান্ত্রিক সিদ্ধান্তের পেছনে রাজনীতির খেলা আছে, তাতে কোন ভুল নেই। সত্যি বলতে কী, রাষ্ট্র এখন মানুষের অস্তিত্বের শেকড়বাকড়-অব্দি আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে। তার নীতিই রাজনীতি। আজ সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান দর্শনের সম্প্রতিক যা কিছু ফসল, সবতাতেই রাজনীতির অভিসন্ধি অনুপ্রবিষ্ট। আমাদের অবশিষ্ট স্বাধীনতাও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ব্যক্তি রাষ্ট্রের নাটবল্টুতে পরিণত। এর প্রতিক্রিয়ায় বহুবচন পর্যবসিত সে। অর্থাৎ আমি হয়ে যাচ্ছি আমরা। আমাকে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত মনে হতে পারে। কিন্তু আমার জ্ঞানমতে (রহস্যময় বিনয় মজুমদার একদিন হঠাৎ বলেছিলেন, ও মশাই! জ্ঞান মানে কিছু জানা। তাই তো?) ওই ধুরন্ধর রাজনৈতিক ভূত আমি দেখতে পাই।

একটা সাধারণ সমস্যা। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীকে এক ভেবে গুলিয়ে ফেলা হয়। বিজ্ঞানী যা কিছু বলেন, তাই বিজ্ঞান নয় এবং যা কিছু করেন, সবই বিজ্ঞান নয়। এমন কি বিজ্ঞানের অনেক হাইপোথিসিসেও সময়, সমাজ ও ব্যক্তির (মার্কসকথিত শ্রেণীচরিত্রেরও) অনেককিছু জড়িয়ে থাকে। সে ক্রোমোসোম-জিন-ডি এন এ, সংক্রান্ত প্রকল্প হোক, কিংবা ব্লাক হোল তত্ত্বই হোক। মনে পড়া উচিত, পাঁচের দশকে রুশ জীববিজ্ঞানী লাইসেংকো-তত্ত্ব সংক্রান্ত বিতর্কে কী হুলুস্থুলু ঘটেছিল!

তিন

প্রিয় সম্পাদক, কী পড়ি জানাতে বলেছেন। ভারি প্যাঁচালো ফরমাইস। প্রকারান্তরে এ-যে এক মহামূর্খের বিদ্যা জাহিরের সামিল এবং অন্যের চোখে ভাঁড় বনে যাওয়া! সোজা কথায় জানাচ্ছি, যা পড়তে ভাল লাগে, তাই পড়ি। মুদির দোকানের ঠোঙাও। কিছুদিন আগে একটি ঠোঙায় দেখি ছাপানো ভোটার লিস্ট। এবং কী বিস্ময়কর, সেই তালিকা আমার গ্রাম বা মৌজার! প্রত্যেকটি নাম স্বপরিচিত; কেউ দেখে যেতে পারেন, টেবিলেই যত্ন করে রেখেছি। কলকাতা ভারি ভূতুড়ে জায়গা।

আমি অজ-স্বভাবী। ভূতের গল্প, ব্ল্যাক ম্যাজিক, ডাকিনী-তন্ত্র, শিকার-কাহিনী, ভ্রমণবৃত্তান্ত, ক্রাইম, সায়ান্সফিক্‌শান, রূপকথা সবই পড়ি। ফুটপাত হাতড়ে নিয়ে আসি। কারণ কিসে কী মিলে যায়, বলা কঠিন। কিছুদিন আগে লরেন্সের (অফ অ্যারাবিয়া) 'সেভেন পিলার্স অফ উইজডম' এনে খবরের কাগজে নাইট ডিউটির পুরো সপ্তাহ মহানন্দে কাটিয়েছি। বিস্তর এ্যাডভেঞ্চার ও খুনোখুনি আছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের কূট অভিসন্ধি এবং লরেন্সরূপী প্রতিনিধির বিচিত্র একটি চরিত্র আছে। আরব জাতি সম্পর্কে স্তুতির ছলে নিন্দা আছে। আমি দেখেছি, খ্রীষ্টান লেখকদের এই এক কুসংস্কার। (তেমনি মুসলিম লেখকদেরও) আবার ইহুদি লেখকরাও কম যান না। আসলে হয়েছে কী, একই উৎসজাত সেমিটিক ধর্মবিশ্বাসের এই তিনটি জ্ঞাতিভ্রাতা পরস্পরের সঙ্গে হাজার বছর ধরে সমানে ঝগড়া করে আসছে। পরস্পরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য এবং নিন্দাও। এব্যাপারটা হিন্দুসন্তানের পক্ষে আঁচ করা কঠিন। তিনি তো ভাবছেন, শ্বেতকায় জাতিসমূহের এতসব সভ্যতাসংস্কৃতি একান্তভাবে সেকুলার এবং এসবের সঙ্গে ধর্মের কোনো সংযোগ নেই। কিন্তু না। এটাই বোঝার ভুল। খুঁজলে ঝুলির বেড়াল বেরিয়ে আসে। ধর্ম একটা মারাত্মক ব্যাপার। বংশানুক্রমে বয়ে আনা জীবাণুর মতো বিপজ্জনক। অবচেতনায় তার বসবাস। ওই ভূতের হাত থেকে খুব কম লোকই রেহাই পেতে জানে।

এ প্রসঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা ভারি দরকার। মধ্যযুগ থেকে বাইবেলী ধর্মের সংস্কারের পর থেকে এখনও অব্দি শ্বেতকায় জাতির বাঘা-বাঘা পণ্ডিতরা নিজেদের এই ধর্মের অন্ধিসন্ধি যত জেনেছেন, তাকে কেন্দ্র করে যত নতুন নতুন তত্ত্ব প্রচার করেছেন, (এবং কি স্থবিশাল ওই অনুসন্ধান ও চর্চা!) আমাদের শিক্ষিত ভারতীয় হিন্দুরা স্বধর্মের ক্ষেত্রে তার দুআনাও করেননি।

তথাকথিত বঙ্গীয় রেনেশাঁর সময় কিঞ্চিৎ চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু আমি বাজী রেখে বলতে পারি, শিক্ষিত হিন্দুসন্তানের অতি-অতি নগণ্য অংশই হিন্দু-ধর্মসমূহ, পুরাণ এবং সংশ্লিষ্ট দর্শনবিষয়ে খোঁজখবর রাখেন। ভারতীয় ধর্ম-সমূহের যে বিশালতার কথা বলা হয়, তা তথাকথিত স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত স্বভাব-প্রাজ্ঞের অবদান। তাঁদের কেউই য়ুরোপীয় শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষিত ছিলেন না। অথচ তাঁরা প্রত্যেকে নিজ-নিজ ক্ষেত্রে সুশিক্ষিত।

একালীন শিক্ষিত হিন্দু বেদ-পুরাণ-লোকায়ত তত্ত্বের চেয়ে বেশি খবর রাখেন গ্রীক মিথলজির। (ক্রেসিডা তোমার আনীত চক্রে চক্রমণ !!) তিনি ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ছবি আঁকতে পারেন। তিনি পাপ-বোধ নিয়ে জ্ঞানগর্ভ ভাষণদানে পটু। সোনার পাথরবাটি! হিন্দু-সন্তানের রক্তে ওই শ্বেতকায় জাতির সেমাইট পাপ-বোধমূলক দর্শন। তিনি গির্জার ঘণ্টা ও সান্তাক্লজ নিয়ে কবিতাও লেখেন। সায়েব সাজার এই কাকুতি সেই ইয়ং বেঙ্গল থেকে চলে আসছে।

মজার কথা, মূলত রাজনৈতিক স্বার্থেই একদা ওই শ্বেতকায় সেমাইট ধর্ম-বিশ্বাসীরাই ভারতীয় হিন্দুর অনেক লুপ্ত জ্ঞানভাণ্ডার উদ্ধার করেন। আত্ম-বিস্মৃত একটি জাতিকে তাঁরাই বস্তুত চাঙ্গা করেন। আজ বেদের একটি প্রামাণ্য অনুবাদ ও পুরাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পেতে হলে তাঁদেরই দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। ভারতীয় পুরাতত্ত্বের তাবৎ সম্পদ তাঁদেরই করায়ত্ত। কিছু হিন্দু পণ্ডিত নিছক শৌভিনিষ্ট আসক্তিতে গলদঘর্ম হয়েছেন বা হচ্ছেন এইমাত্র। (সেদিন স্টেটসম্যানে দেখি, কোন পণ্ডিত দাবি করেছেন সিন্ধুলিপির ভাষা বৈদিক ভাষারই শাখা !!)

ব্যতিক্রম নিশ্চয় আছেন। যেমন কোশাম্বী, সাংকালিয়া, সুনীতিকুমার চাটুয্যে, নীহাররঞ্জন রায়, সুকুমার সেন, দেবীপ্রসাদ চাটুয্যে প্রমুখ পণ্ডিতরা। কিন্তু তাঁরা মুখ খুললেই শৌভিনিষ্টরা যথেচ্ছ শোরগোল তোলেন। ওদিকে শ্বেত-কায় ভারতবিদরাও সবাই যে সংস্কার মুক্ত, তাও নন। তাহলেও পৃথিবীর যে-কোন দেশের যে-কোন বিষয়ে জানতে টানতে হলে এঁদের সংগ্রহশালায় না ঢুকে উপায় নেই।

আমার মতো পল্লবগ্রাহীর পক্ষে একটা সুবিধে, আমি সেমাইট ধর্মবিশ্বাসী পরিবারে জন্মেছিলাম। কোন শ্বেতকায় পণ্ডিতের বার্তায় কতটা ধর্মীয় গন্ধ আছে টের পেতে দেরী হয় না। আর্বি-ফার্সি জানিনা। অথচ সুফীতত্ত্ব পড়তে গেলাম। সেই খ্রীষ্টান সায়েব লিখিত সমাচার পড়তেই হল। কতটা বাদ দেব, কতটা নেব জানি বলেই আনন্দে ছিলাম। নিশ্চিন্তে পড়া গেল। জানতে

পারলাম, সুফীদের সঙ্গে জরুথুষ্ট্রীয় চিন্তার সংযোগ কোথায় এবং ভারতে তার কী ফলাফল দেখা গেছে। মধ্যযুগে খ্রীষ্টান সন্তরা সুফীদের প্রভাবিত করেছিলেন—এই সিদ্ধান্ত অবশ্য আমল দিলাম না। তার অসংখ্য কারণ আছে। এখানে বলার দরকার দেখিনা।

তাহলেও আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির গায়ে বাইবেলের গন্ধ ভুরভুর করছে (ওই কামু-কাফকা-সার্ত্রেরও)। গন্ধটা পুরনো হলেও ঝাঁঝালো। শূন্যতা, অস্তিত্ব সর্বস্বতা, এ্যাবসার্ডিটি, ব্যাক টু নেচার, মহাকাশে ভেসে প্রাণবীজের মর্তে আগমন—সর্বত্র। এমন কী, কমিউনিজমের স্বপ্নেও। ভুললে চলবেনা, মার্কস সেমেটিক ধর্মাবলম্বী-পরিবারের সন্তান। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন ইহুদী। অ-সেমিটিক পরিবারে মার্কসের আবির্ভাব সম্ভব নয়। কমিউনিষ্ট আদর্শ রাষ্ট্রের ভাবরূপে (কিংবা প্রকল্পে) সুপ্রাচীন সেমিটিক (ইহুদি) আদর্শ কমিউনিটি জীবনের অনবদ্য মিল আছে বলেই প্রশ্ন আমাকে তাড়া করে। কুমরানে (জরডানের মৃতসাগর তীরবর্তী) ইহুদী এসেনিষ্ট গোষ্ঠির মঠবাড়ির যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, তা খুঁজে সেই কমিউন জীবনযাত্রার স্পষ্ট চিত্র পাওয়া গেছে। আধুনিক চীনের কমিউন ব্যবস্থায় তারই ছাপ চিনতে দেরী হয়না। (কে গুস্তাক ফুং-এর মিথলজি এবং যূথচেতনা সম্পর্কিত তত্ত্ব উল্লেখ্য)।

কিছুকাল আগে জন কোহেনের 'দি কি' পড়েছি। তাঁর প্রতিপাদ্য: আদিতে মিল পৃথিবীতে একটিমাত্র মুগোষ্ঠি এবং তাদের ভাষা স্বভাবত একটি। পরে সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও একাধিক হয়েছে। এখনও খুঁজলে কিছু মূল শব্দের মুখোমুখি দাঁড়ানো যায়, যা সব ভাষায় লুকোনো আছে। এই কি-ওয়ার্ডগুলি সাবজেকটিভ এক্সপ্রেসান নয়, এবজেক্ট কেন্দ্রিক।

খুব রোমাঞ্চকর প্রসঙ্গ। পরে এক প্রত্নবিদের লেখায় জেনেছি, কোহেন গোঁড়া সেমেটিষ্ট অর্থাৎ সেমিতিবাদী। তাঁর প্রতিপাদ্যের পেছনে আছে ডার-উইনী তত্ত্বের সমর্থন। মাত্র একজোড়া বানর-প্রজাতির কোনও প্রাণী (পুরুষ ও স্ত্রী) থেকেই নাকি হোমো সেপিয়েনের উদ্ভব।

কিন্তু তারও পেছনে কি বাইবেলী আদম-ইভের মিথ আব্‌ছা দাঁড়িয়ে নেই?

চার

প্রিয় সম্পাদক, আশা করি আমার পাটশালার একটা রেখাচিত্র আঁকতে

পেরেছি। এবার প্রশ্ন উঠতেই পারে, কেন আমার মুখ এমন পেছনে ফেরানো? কেন অতীতের অন্ধকারে ঢুকে যেতে ভালবাসি?

এটা প্রতিক্রিয়া হতেও পারে, একটা তদন্ত হতেও পারে। আমার তদন্ত মানুষের মূল ব্যাকগ্রাউণ্ডে। হেরোদোতুসের 'ইতিহাস' বইটি এখন আমার টেবিলে। ইতিহাস তাঁর কাছে ছিল 'রিসার্চ'। আসলে হিসটরি কথাটা এসেছে গ্রিক ক্রিয়াপদ হিস্টোরিন থেকে। তার মানে তদন্ত করা। আমার মাথায় তদন্তের জীবাণু গিজগিজ করছে।

আজ ৮ এপ্রিল। এখন সকাল দশটা। আমি অনিদ্রায় ভুগি। তাই রাত কাটাই বই পড়ে। গত রাতে পড়েছি 'দি জার্নি অফ বার্ক ব্যাণ্ড উইলস।' অভিযান এবং নৃতত্ত্বের বই। বিরল সৌভাগ্য, গত রাতে লোডশেডিং ছিল না। শেষ ফেরার সময় মসজিদে আজান শুনলাম।

সম্পাদক মশাই, এখন আমার উপন্যাস লেখার সময়। অতএব আর নয়।

কি পড়ি

আনন্দ বাগচী

পররুচি পড়না বললেই বোধ করি ঠিক হয়। কারণ মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা ইংরেজী দুই ভাষার বইয়েরই দাম এত বেড়ে গেছে এবং সেইসঙ্গে জরুরী প্রয়োজনীয় জিনিসেরও এমন হারে মূল্য স্ফীতি ঘটেছে যে আমার মত সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে বই কেনা কেবল যে রীতিমত বিলাসিতা তাই নয়, পারিবারিক দৃষ্টিতে স্বার্থপরতারও নামান্তর। আমরা অনেকেই তাই আগের মত খেয়ালখুশিতে বই কিনতে পারি না। নিয়মিত বই কেনার বড় মাশুষী তো ছাড়তেই হয়েছে, বলতে গেলে বই কেনার অভ্যাসই বদলাতে হয়েছে। অথচ প্রিয় বই, বিখ্যাত বই, নতুন বই—রক্তের মধ্যে তার একটা আলাদা টান ছিল বাঙালী মধ্যবিত্তের। নতুন টাইটেল; নতুন মলাটের আকর্ষণ-ই অন্য। অথচ এখন বাজারে অনেক জিনিসের মত যথাসময়ে সংগ্রহ করতে না পারলে বই-ও বেমালুম উধাও হয়ে যায়। তাই নিজের রুচিমত বই সহজে হাতে আসে না। লাইব্রেরী হ্যাবিটও আমার নেই, আর নিকটবর্তী যে সব সাধারণ পাঠাগার আছে তাদের সংগ্রহও বেশীর ভাগই রমরমে গল্প-গিলিয়ে পাঠকের চাহিদা অনুসারেই পড়ে উঠছে দিন দিন। তাই নতুন বই পড়ার জন্যে ব্যক্তিগত সূত্র

থেকে ধার করা বইয়ের ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে ইদানীং। অর্থাৎ যাঁরা এখনও কিছু কিছু বই কেনেন, অর্থাৎ কোন রকমে দুচারখানা বই কিনে পিত্তি রক্ষা করে চলেছেন তাঁদের আস্থা ভাজন হতে হয় অগত্যা। কিন্তু বই ধার দেয়া টাকা ধার দেওয়ার চেয়েও দুঃখজনক কারবার। কারণ টাকা ধার দিয়ে কখনও কখনও মনোমালিন্য এবং বন্ধুত্বহানি ঘটলেও টাকা বেশীর ভাগ সময়েই আদায় হয়, অনেক সময়ে হয়ত সুদে আসলেও আদায় হয়ে থাকে। আর টাকা ফেরত পাবার পর আর অর্থজনিত দুঃখ থাকে না। কিন্তু বই? ভাল বই অনেক সময়ই মারা যায়। অনেক চেষ্টায় অনেক বিলম্বে যদি ফিরেও আসে তবে অনেক সময়ই তা ধর্ষিত হয়ে ফিরে আসে। সেই ভার্জিন গ্রন্থটি আর ফেরেনা। মার্জিনে মন্তব্য বসে যায়। যেখানে সেখানে ইমোশনাল আণ্ডার লাইন, মলাট বিবর্ণ কিংবা পটু ছেঁড়া, পাতাগুলো সুতোছুট—নতুন বাঁধানো দাঁতের মতই লেভেল ক্রস করে উঠে আসে। বই আত্মসাৎ করার দোষে আমরা অনেকেই দোষী। অর্থে যে নির্লোভ গ্রন্থে সে নয়। অর্থ-ঋণের বেলায় যে বিবেকবান, বই-এর ক্ষেত্রে সে নাও হতে পারে। এর ফলে বই চাওয়া যেমন অস্বস্তিজনক, বই পাওয়ার ব্যাপারটাও তেমনি আশঙ্কা জনক।

তাই আমার পররুচি পড়না। পরে তার রুচিমাফিক যে সব বই কেনে এবং তার মধ্যেও তার মার্জীমাফিক যে বইগুলি স্বল্প কালীন মেয়াদে ধার দিতে রাজী হয়। মোটামুটি তার সাহায্যেই আমার পড়ার অভ্যাসটি টিঁকে আছে।

তবে স্বীকার করতে লজ্জা পাই না যে আমি কোন দিনই সিরিয়াস টাইপের পাঠক নই। তা যদি হত, নিশ্চয়ই উপরিউক্ত ভূমিকা ফাঁদতাম না। নিয়মিত এবং ক্রমপরম্পরা বজায় রেখে বাছাই করা বই পড়ার ইতিহাস নেই আমার জীবনে। পড়াটা আমার বেলায় হয়েছে খাপছাড়া ভাবে, খামখেয়ালের সঙ্গে। পড়াটা আমার জ্ঞান পিপাসা মেটাবার জন্যে নয়, আনন্দের জন্যে। অবসর বিনোদন এবং শ্রমলাঘবের জন্যে। তাই আমার নির্বাচনের মানদণ্ড নেই, এবং কোনো একটি বিশেষ গ্রন্থ আমার কাছে তাৎক্ষণিক জরুরীও নয়। আমার রুচি তাই বুদ্ধিজীবিতায় এবং আভিজাত্যে শাণিত নয়, বলতে গেলে গ্রাম্য, নিতান্তই গ্রাম্য। মুড়ি মিছরিকে আমি কোন দিনই উন্নাসিক দৃষ্টিতে রাখিনি। আমার কেমন মনে হয়েছে মুড়ি মিছরি পরস্পরের পরিপূরক, মুখের স্বাদ বদলেই শুধু সাহায্য করে না। স্বাদ বৃদ্ধিও ঘটিয়ে থাকে।

ছোটবেলা থেকেই আমি সেই হিসেবে সুবোধ বালক, যাহা পাই তাহাই

খাই, যাহা ধরি তাহাই পড়ি। খাদ্যাখাদ্য, পথ্য অপথ্য, পাঠ্যঅপাঠ্য আমার কাছে ছিল না। সুখের বিষয় কি দুঃখের জানি না, আমার ক্ষণজীবী স্মৃতি এই ভাল-মন্দের অনেকখানিই ভুলে গিয়ে অজীর্ণের হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছে।

কিন্তু খানার বেলায় যেমন, পড়ার বেলাতেও তেমনি পরের রুচিমাফিক জিনিস হলেও সেই বস্তুরসের আস্বাদন, এবং সেই বস্তুর চর্বন এবং রোমন্থন আত্ম-রুচিবৎই হয়ে থাকে। তাই যে বইই যখন পড়েছি তা থেকে নিজের মনোমত করেই কিছু না কিছু পেয়েছি। এই প্রাপ্তির পরিমাণ কোন গ্রন্থ থেকে বেশী, কোন গ্রন্থ থেকে নিতান্তই কম হতে পারে।

এখনও, এই পরিণত বয়সেও খবরের কাগজ আমি সবটা পড়িনা, হয়ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবরেরও হেডলাইনের বেশী তলাই না। অনেক তুচ্ছ খবরও খুঁটিয়ে পড়ি। হয়ত বিজ্ঞাপন হারান প্রাপ্তি নিরুদ্দেশের বিবরণ কি স্মৃতি চারণ আমার মনকে বেশী করে টানে। দিনের কাগজের চেয়ে বাসী কাগজের টুকরো অংশ যখন ঠোঙা হয়ে ঘরে ফেরে তখন বেশী আকর্ষক হয়ে ওঠে। অনেক জ্ঞাত এবং খ্যাত বইয়ের চেয়ে মলাটহীন, লেখকের এবং বইয়ের নাম চিহ্ন হীন অজ্ঞাত-কুলশীল গ্রন্থ চোখের নজর এবং মন কেড়ে নেয়। হয়ত পাঁজির প্রয়োজনে পাঁজি খোলা হয়না, তার লোমহর্ষক কিম্বা হাস্যকর সচিত্র বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাগুলি আমাকে টেনে নিয়ে যায়। এই পঞ্জিকা এখনও তার বিজ্ঞাপনীয় আয়োজনের মধ্য দিয়ে সেদিনের সদ্যসাবালক কলকাতার বিচিত্রচারী মনোযোগের এবং কলকাতার দিকে আড় চোখে-তাকানো অথও বঙ্গদেশের সংস্কার-সংস্কৃতি-রুচি-রসবোধের এবং অবিশ্বাস্য পাকপ্রণালীর মধ্য দিয়ে আসা জীবনযাপনের ছাঁদ ও মূল্যবোধের ছায়া ধরে রেখেছে। অনেকখানি স্পষ্ট করে জানার চেয়ে একটুখানি জানার আলোছায়া-সঞ্চারী কল্পনা দিয়ে অনেক বেশী পরিমাণ পাওয়াকেই আমার গ্রাম্য স্বভাব বেশী স্বাগত জানিয়ে থাকে।

ভ্রমণ সাহিত্য, শিশু সাহিত্য, রহস্যকাহিনী, মনে হয় সকলকেই টানে, টানে রঙ্গ-ব্যঙ্গের রচনা—এতে নতুনত্বের কিছু নেই। সামান্য নির্বাচিত কবিতা, বিশেষ বিশেষ গানের মত বাঙালী, মেটামুটি শিক্ষিত বাঙালী মাত্রকেই টানে। বাঙালী পাঠক কবিতা পড়ে না, সকলেই কবিতা পড়েনা না বলে—অনেকেই কবিতা পড়ে না, কেউ কেউ পড়ে, অতি সামান্য, নগণ্য, মুষ্টিমেয়—একথা আমি বিশ্বাস করি না। আসলে বাঙালী পাঠক সবাই কবিতা পড়ে, তবে সব সময় পড়ে না, কখনো কখনো পড়ে। এবং সব কবিতা পড়ে না কোন কোন কবিতা

পড়ে, এবং অনিয়মিত। কবিতা আমারও প্রিয় বিষয়। স্বেচ্ছায় অনিয়মিত এবং অনিচ্ছায় প্রতিদিন নিয়মিত আমাকে কবিতা পড়তে হয়। কবিতাকে অবশ্যপাঠ্য সিলেবাসের মধ্যে ফেলে দিলে যেমন তার রূপরস বদলে যাওয়া স্বাভাবিক, অনেক সময় আমার ক্ষেত্রে তাই ঘটছে। পড়ামাত্র অর্থ বুঝতে পারি, ব্যাকরণ বুঝতে পারি, ছন্দের ঘাটতি কিংবা গোঁজামিল এবং অ্যানিমিক কণ্ডিশন টের পাই, কিন্তু কবিতা ইদানীং অনেক সময়েই আর আগের মত বুকের ভেতরে দ্রুত হাওয়াবদল ঘটায় না।

তবু একথা ঠিক, ভাল গদ্য লেখার পেছনে এবং ভাল গদ্যকে বহুগুণিত করে পাওয়ার নেপথ্যে কবিতার অবদান আছে। ভাষার একটা শব্দভেদী পরিণতি আছে। উত্তরণ আছে। সেখানে পৌঁছুতে হলে কবিতাকে বোধের মধ্যদিয়ে জানা চাই। শব্দের অব্যয়ী শক্তিকে অব্যাহত বিচ্ছুরণকে ভাষায় মধ্য দিয়ে পাওয়ার চাবিকাঠি আছে কবিত্বের মধ্যেই। তাই যিনি গদ্য লিখবেন তিনি কদাচ গদ্য লিখে থাকলে ভাল হয়, অন্তত কবিতায় রুচিশীল পাঠক হওয়া সব সময়ই প্রয়োজন।

আমার বই পড়ার তালিকা কুলীন নয়, কহতব্য এবং দীর্ঘ নয়, সেকথা আগেই বলেছি। এখন শুধু একটি বইয়ের কথা বলেই আমার এই স্বীকারোক্তি শেষ করতে চাই।

এলোমেলো বাহান্ন রকমের বইয়ের মধ্যে যে বইটি আমি কখনও হাতছাড়া করিনি এবং সময় পেলেই ফিরে ফিরে পড়ি সেটি হচ্ছে গীতবিতান। গীতবিতানের গানগুলো আমার বরাবরের সঙ্গী। এই গানের কথাগুলো আমাকে কত সময়ে কতভাবে যে নাড়া দিয়েছে তা বলবার নয়। সুরের অনুশাসন ভেঙে, স্বরলিপির ট্র্যাফিকরুল অমান্য করে এবং কখনো কখনো সুরের সহবতে এবং সহবাসে রেখে তাকে নতুন করে ফিরে ফিরে পাই। এই রবীন্দ্র নির্যাসিত গ্রন্থটি আমার কাছে অসাধারণ মনে হয়। সংযমের শাসন আর স্বতস্ফূর্ত সরলতা এমন এক অঙ্গে কম রচনাতেই পাওয়া যায়। এই সংগীত আকৃতির সনেটগুলির মধ্যে কঠিন বন্ধন এবং মুক্তির আনন্দ দুইই আছে। এমন হৃদয়স্পর্শী অনহঙ্কারী রচনা আমি প্রায় পড়িনি বললেই চলে। এই কথাগুলো আমার স্বগতোক্তির মত। মনের গভীর অন্তস্তলে না-বলা বাণীর মত ফুটে উঠে আমাকে অভিভূত করে।

ব্যক্তিগত রচনা

দীপেন্দ্রনাথ

প্রবীর সেন

একটি মানুষ সকাল-সন্ধ্যায়, বেশ কয়েকদিন যাবৎ, এই শহরের নানাদিকে চষে ফিরছে। এ দোর থেকে সে দোরে। এর কাছ হয়ে ওর কাছে। বিভিন্ন শিবিরে খণ্ডিত কমিউনিষ্ট ও তাদের নাতি-উচ্চ ভল্টেজ-সম্পন্ন সমর্থকেরাই তার লক্ষ্য। তখন কালটা শীতের। তার হাতে একটি শারদীয় পত্রিকা। তাতে একটি গল্প আছে। এই গল্পটি সে ঐ মানুষগুলিকে গভীর প্রত্যয় নিয়ে পড়িয়ে চলেছে। কোথাও বা শুনিয়ে। না, গল্পটা এই মানুষটার নয়।

গল্পটা 'শোক-মিছিল।' লেখক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। যার অকাল-প্রয়াণে হাজার হাজার মানুষ কেঁদেছে।

একটা ব্যাপার এখানেই পরিষ্কার বুঝে নেবার অবকাশ আছে। শোক-মিছিলকে মানুষটা যে অনবদ্য রচনা মনে করেছে তাতে কোনো ভুলই নেই। থাকলে, সে গল্পটাকে এমনভাবে বয়ে নিয়ে বেড়ায়? কমিউনিষ্ট আন্দোলনের কুশ্রী বিভক্তি যে এই বাহক-মানুষটিকে সত্যিই আর্ত করেছে, তাও আমরা বুঝি। কারণ, মাত্র অসাধারণ রচনা বলেই যদি সে শোক মিছিলের ভার বয়ে বেড়াতো, তাহলে, তাকে আরো কোনোকোনো লেখাও লোকজনকে এইভাবে পড়িয়ে-শুনিয়ে ফিরতে আমরা দেখতাম।

এই দুটো বৃত্তান্তই ঘটনাটার মূলে সক্রিয় একথা বাইরে থেকেও যে-কেউ বুঝতে পারেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে গল্পটার অনন্যসাধারণত্ব ও পার্টি-বিভক্তিজনিত বেদনার পাশাপাশিই আরো একটা অনিবার্য হেতুও আলোচ্য ঘটনার মূলে অসামান্য কারণ-স্বরূপে প্রভাব ফেলেছিল।

আভ্যন্তরীণ সেই সংবাদটি, একশো ভাগ দায়িত্ব নিয়েই, আমি পাঠককে

দিতে চাই। সে কারণটা শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাবোধ। মানুষটা দীপেন্দ্রনাথকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতো। করে। নতুবা, পূর্বোক্ত দুটি জোরদার কারণ সত্ত্বেও, তৃতীয় কারণটির অনুপস্থিতিতে, তার পক্ষে ঐ কাজ প্রায় অসম্ভব ছিল বলে আমি নিশ্চিত জানি।

কারণ, যথার্থ ইন্টিগ্রিটির একটা প্রশ্ন আছে। এবং আছে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সত্যকার আইডেন্টিফিকেশনের প্রশ্নটাও। এই দুটি ফ্রন্টেই নিয়ত সঞ্চরমান যে-সংগ্রাম - তাতে শোকমিছিল গল্পটি সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিল যতোদূর জানি, আমাদের বয়ঃসীমায় এই অর্জন বোধকরি একমাত্র দীপেনেরই।

কমিউনিষ্ট পার্টি দু-টুকরো হলে, তার সমবয়স্ক আমরা গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়েছি, বড়োজোর আস্তিন গুটিয়ে টেবিলে ঘুষি মেরে কাপের চা ছলকে তুলেছি—নয়তো, শ্রদ্ধেয় এবং পরীক্ষিত নেতাদের মাথা ফাটিয়েছি বা জুতোর মালা দেবার ষড়যন্ত্র করেছি। অন্যদিকে শোকমিছিলের লেখক কিন্তু কায়িক অর্থেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। দীর্ঘ একটা সময় কাটে তার অসুস্থ অবস্থায়।

তাই, ডাক্তারেরা ভিয়েতনামের জন্য তার রক্ত নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে থাকলেও, আমরা সরাসরি জ্ঞাত আছি, আমাদের কালের কোনো একটিও লেখকের রক্ত যদি মেকড়ের ধমনীতে হুবহু মিশ খেতো, তো, সে এই দীপেন্দ্রনাথের।

একেবারেই সমবয়স্ক দীপেন চলে যেতে আমাদের যে শোক তাকে বাইরে প্রতিষ্ঠা দেবার যোগ্য সপ্রতিভ লেখনী আমার নয়। পরন্তু, আমাদের সেই শোকের চারিদিকে এখনো একটা কঠিন স্তব্ধতা জারি আছে। ফলত, যে নিতল শূন্যতা সেমৃত্যু দিয়ে রচনা করে গেল—তাকে মাপতে পারি, তার যোগ্য কোনো ফিতের মালিকানা আমাদের নেই। চলতি ধারণার বহির্বর্তী উঁচু-জাতের মানুষগুলির নিরিখে আমাদের এই অকেজো অবস্থাটা চালু থাকে দীর্ঘতর কালকে ব্যাপ্ত করেই। দীপেনকে ঘিরেও আমরা এমনই এক শোকের অভিভবের মধ্যে বাস করছি। সে তো কেবল সন-তারিখের সংখ্যানেই অকালে চলে গেল না, আমাদের সার্বিক অপ্রস্তুতির নিরিখেও তার এটা সত্যিই অকাল-প্রয়াণ!

যশ ও প্রতিষ্ঠার মানসে ব্যক্তির স্ব ভাবিক আকাঙ্খা আজ যখন, তুলকালাম লালসার মূর্তিতে, বিকট হাঁ নিয়ে গিলতে এলো—তখন, স্বকালের প্রতি হাড়ে-হাড়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বার মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি থেকে একটিও সমবয়স্ক মানুষ যদি

আমাদের বাঁচাতে এগিয়ে এসে থাকে, তো সেই মানুষটিই সহস্রাধিক মানুষকে সত্যিসত্যি কাঁদিয়ে রেখে, ডংকা বাজিয়ে চলে গেল—বিগত জানুয়ারীর চোদ্দই।

দীপেন্দ্রনাথের কারণে প্রত্যেকটি শোকাশ্রুর পশ্চাতে উপস্থিত শ্রদ্ধাবোধ। এইখানেই ওর সবচেয়ে বড়ো জয় বলে আমার মনে হয়েছে। এই বয়েসে এতোখানি অথও শ্রদ্ধা নিয়ে কজনই বা চলে যেতে পায়! এইখানে দীপেনের সিদ্ধি বস্তুতই ঈর্ষণীয়।

লেখাই বাহুল্য, আমার এই চেষ্টা জনৈক ব্যক্তির চেষ্টা মাত্র। অর্থাৎ আমি না চাইলেও আমার এই চেষ্টার মধ্যে ব্যক্তিগতর ছাপ স্পষ্টতই পড়বে। শেষ অব্দি তাতে অবিশ্যি কিছু এসে যাবে না, যদি না সত্যচ্যুত হই।

রমেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে আমার বয়েসের ফারাকটা পরিপূর্ণ চল্লিশের। তিনি আমার পিতার জ্যেষ্ঠাগ্রজ। আমার তখন বয়স বিশ হবে হয়তো। মুক্তারাম-বাবু ষ্ট্রীটের বিপুল ঐতিহ্যমণ্ডিত রকে তুজনে বসে আছি। তিনি আমায় সিগ্রেট অফার করলেন। আমি সেই বয়সেই একান্ত নাস্তিক হয়ে উঠেছি। নচেৎ নির্ঘাৎ শরণ নিতুম নিকটতমা ঠনঠনেশ্বরীর! জ্যাঠামণির যুক্তি: দীপেন আর তুমি তো একই বয়েসী! একটিবার ভাবুন! তখন অবশ্যই এসব কথা ভাবিনি। তখন, দীপেনকে আমার বেশ একটু জ্যাঠামশাই মনে হয়েছে বরং। মনে হয়েছে, এই-সব উটকো 'প্রগতিশীলতা'ই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের বারোটা বাজাবার পক্ষে পর্যাপ্ত। পরে এবং আজ মিলিয়ে নিয়ে বুঝেছি—দীপেন অন্তত যথার্থ বড়ো বলেই ওটা পেরেছিল। চটকদার কিছু করতে হবে বলেই করেনি।

চোরের মার বড়ো গলার মতোই বাইরের ঢক্কানিনাদে যে-সমাজটা নাকি ভাববাদী, আর বাস্তবিকপক্ষে যে অন্তঃসারশূন্য সমাজটা গেল কয়েক দশক যাবত ষোল আনার উপর আঠারো আনাই দেহসর্বস্ব ভোগবাদী, সেই সমাজের বুকে সহজে পা ফেলে চলার নিকষে দীপেনের শরীরটা ছিল কী পরিমাণেই না ঘর্ষিত! অথচ কী গভীর সহজ পদক্ষেপেই হেঁটে গেল জীবনভর। দেহের অন্য কিছু যেন পরোয়া করারই নেই! অথচ সে আদৌ ভাববাদী ছিল না—ছিল খাঁটি বস্তুবাদী।

ব্যক্তিগত জীবনে স্বাভাবিক মানবধর্মের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক মানবমুক্তি চিন্তার এমন এক সহজ সুস্থ ও সুন্দর মেল দীপেন ঘটাতে পেরেছিল, যাতে কিছু-না-

থাকাটাকেও সে অমন অনায়াস অবহেলায় জয় করে নিতে পারে। এই মানুষকে যদি আন্তরিক প্রণিপাত জানাতে কার্পণ্য রাখি, তাহলে কি, যাদের উদ্দেশ্যে এই বৎসরটা আন্তর্জাতিকভাবে উৎসর্গিত, সেই প্রজন্মটা বড়ো হয়ে আমাদের প্রতি ভ্রূকুটিবিহীন চাইতে পারবে?

দীপেনের সৃষ্টিশক্তির উন্মেষ ও পরিপক্কতা অর্জিত হয় যে-পরিমণ্ডলে সেটি সাহিত্যসেবক সমিতির। এই সংস্থার নিয়মিত অধিবেশনগুলিতে আসতেন দেশের এমন মর্যাদামণ্ডিত লেখক ও মনঃস্বী সমালোচকের নাম এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলা যাবে না।

নিয়মিতদের মধ্যে শেষের বেশ কয়েকটি বছর সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন—ডঃ সুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত। শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুধীর চাকী মহাশয়।

ডঃ সেনগুপ্ত ইংরিজির বিখ্যাত অধ্যাপক। দেশবিদেশের কল্যাণমিত্রে তাঁর গতাগতি ছিল অনায়াস। মূল রামায়ণের সর্গ ধরে-ধরে যিনি স্মৃতিতে রেখেছিলেন গেঁথে। মার্ক্স ও গান্ধীর ঘোরতম বিরোধী। কম করে বললেও সে বিরোধ প্রায় বিদ্বেষের সমগোত্রীয়। অথচ সার্থক রচনা কমিউনিষ্টের লেখনী-নিঃসৃত হলেও যাঁকে সোচ্চারে প্রশংসা করতে দেখা গেছে হামেশাই। সকলেই এঁকে শ্রদ্ধা করতেন।

সুনীলবাবু র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট। মানবেন্দ্রনাথের নৈষ্ঠিক অনুরাগী। এমনকি সুভাষচন্দ্রকেও প্রকৃত বামপন্থী বলে স্বীকৃতি দেন না। সাহিত্যের 'টেকনোলজিকাল' বিষয়ে বিলক্ষণ বুৎপন্ন। এবং কোনো রচনার আনুপূর্বিক ডিসেকশনে এই সিদ্ধবাক মানুষটি বস্তুত পারঙ্গম। সমিতির অধিবেশনগুলিতে এঁনার কথাও পক্ষাপক্ষ সবাই মন দিয়ে শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন।

এবং যতোদূর মনে করতে পারি, কারো চেয়েই ন্যূন ছিলেন না তৃতীয় ব্যক্তি। সুধীর চাকী মশাই ছিলেন প্রতিবাদী প্রকৃতির অথচ সৌজন্যে স্মিত। ব্যাপকতম পরিসরে গভীর প্রকৃতির অধ্যয়নশীলতার অধিকারী। যথার্থ কমিউনিস্ট। নিয়মিত অধিবেশনগুলিতে সাহিত্যপ্রসংগে মার্ক্সিজম ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যে-কোনো আক্রমণের সবচেয়ে সাফ জবাব আসতো তাঁরই ধীমন্ত উচ্চারণে। যার কোনো কোনোটি এখনো যেন মুক্তার মতো স্মৃতিতে।

এহেন প্রাজ্ঞ-সমাবেশেও তরুণতম দীপেনের কথা শুনবার অভিপ্রায়ে বয়েস ও মতবাদ নির্বিশেষে বোধকরি সকলেরই উন্মুখ ব্যগ্রতা বারবার লক্ষ্য

করা গেছে। অথচ দীপেনের বয়েস তখন কুড়ির নিচে! আজ সেই বিশ-পঁচিশ বছর পেছনকার ছবিটাকে মনেমনে ঝালিয়ে যেটুকু দেখতে পাই—তাতে, সেখানে কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিল না।

দীপেনের লেখায়, তার মতামতের ক্ষেত্রে এবং জীবনচর্চায়—মার্ক্সবাদী-জীবনদর্শনের প্রশ্নে কোথাও একচুল আপোস না করেও সর্বদাই একটি খাঁটি সাহিত্যবুদ্ধির সুরক্ষা যাঁরাই লক্ষ্য করেছেন, তারাই বুঝবেন, বিকাশের একটা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে সমিতির এই আদর্শ পরিমণ্ডল তাকে সত্যপথে গড়ে উঠতে কী অপূর্ব আনুকূল্য দিয়েছে।

এই সমিতিসূত্রেই দীপেনের সান্নিধ্যে আমি আসি। রমেশচন্দ্র অসম্ভব স্নেহ করতেন তাকে। হয়তো বা সেই কারণেই ওর প্রতি আমার অনুরাগটাও ছিল ঈষৎ ঈর্ষা মিশ্রিত। রমেশচন্দ্র সেন চোখ বুজলেন এবং নামজাদা ও ধুরন্ধর জনৈক প্রকাশক-কাম-লেখকের অর্থ-পৈশাচিকতা এবং হয়তো আরো কোনো গূঢ় কারণে সমিতি উঠলো লাটে। দীপেন নিষ্ঠার সঙ্গে ক্রমশ বেশি করে ঢুকলো পার্টিতে। আমি তার সামান্য আগেই পার্টির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি। দীপেন ক্রমান্বয়ে পৌঁছতে থাকলো বিপ্লবী জীবনের অভ্যন্তরে। আমি দূরবর্তী প্রান্তসীমা থেকে গভীরতম হতাশা নিয়ে দেখে যাচ্ছি স্বদেশীয় মার্ক্সবাদী বিপ্লবী-সাধনার দৈন্যের দিকটাকে! অর্থাৎ এই সময়ের হিসেবে নজর করে দেখলে, বলতেই হবে, আমাদের মধ্যে একটা মেরু-প্রমাণ পার্থক্য তখন নিশ্চিত স্পষ্টতা নিয়ে উপস্থিত। জলন্ত ফার্নেস আর কারখানার বাইরে এক-টেরে স্তূপীকৃত গরম ছাই-এর যে ব্যবধান, আর কি!

এমন একটা আত্মোৎসর্গিত মানুষকে যারা রাজ্যের বাজে লেখা মায় নকল লেখা দিয়েও বিব্রত করেছে, তাদের আটকাবার অমোঘ কায়দাটা কী ভাবে আয়ত্ত করা যায়—এই অপরিহার্য দুশ্চিন্তায় কি দীপেনের অনেকগুলি দিনরাতের কিছুটা করেও মূল্যবান সময় অপব্যয়িত নয়? অবশ্য এখানেই তো আসল কথাটা। অর্থাৎ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে একবাক্যে বড়ো।

দেশটাকে টুকরো করে দিয়ে ত্রিভংগ স্বাধীনতা যে কালে আমরা ড্যাং-ড্যাং করতে-করতে নিয়ে এলুম, তারো হয়তো বেশ একটু আগে থেকেই, সামাজিক ক্ষেত্রে যে-বিকটব্যাধি ব্যাপকভাবে আমাদের আগাপাশতলা গ্রাস করতে শুরু করে—এক কথায় তাকেই বলতে পারি আত্মকেন্দ্রিকতা। নানা সময়ে নানা

সূত্রে প্রত্যক্ষগোচর এই ব্যাধির বিভিন্ন উপসর্গগুলিই এক্ষণে আমাদের বিচলিত করে। করে বিভ্রান্ত।

লেখাই বাহুল্য, শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতি-কর্মীদের ভিতরে এই ব্যাধি, আত্মকেন্দ্রিকতার ব্যাধি, আজ, হয়তো নানা বাস্তব কারণেই, সবচেয়ে উৎকট রকমে পুচ্ছটি তার উচ্চে তুলে নাচাচ্ছে। ঠগ বাছতে গাঁ সত্যিই উজাড় হয়ে যাবে।

তদুপরি, এই অসম্ভব ক্ষতিকারক নোংরা ব্যাধিকে সে আন্তরিক ঘৃণা করলেও, প্রজ্ঞার আলোকে তার চিত্ত যথার্থ উদ্ভাসিত ছিল, আর ছিল বলেই রোগীকে সে পারতপক্ষে ঘেন্না করেনি। এটিও তার চারিত্রশক্তির উজ্জ্বল সাক্ষ্য। অথচ ব্যাধিগ্রস্তদের সাথে সে একটি কদমও আপোসে পা ফেলেনি। ফেলবে কী করে? প্রকৃতিতেই তা ছিল না যে!

আত্মকেন্দ্রিকতার সঙ্গে সমঝোতা করেনি বলেই, দীপেন সর্বদা সটান চলেছে এবং দাপটে। আমাদের কাছে সবকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে যে রিয়েল দীপেন্দ্রনাথ তার এইটেই সর্বাপেক্ষা মহৎ পরিচয়। সমবয়সী হওয়া সত্ত্বেও এই দীপেনকে আমি সর্বান্তকরণে প্রণাম জানাই॥

কবিতাগুচ্ছ

জয় গোস্বামীর কবিতা

শান্তি লাহিড়ী

এক ॥

জয়ের কিছু কবিতা পড়ে উঠলাম। ধ্যানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল পার্থিব পৃথিবী—যা সবটুকু আমার মত নয়, কোনদিন হবেও না। তাকে জেনে নেবার মত একটা হৃদয়, পরিপূর্ণভাবে মানিয়ে নেবার জন্য আমার চোখ যেমন স্বতই ক্ষমাসুন্দর হয়ে ওঠে—ঠিক তেমনি এই কবিতাগুলো সন্ধ্যার চেনা লোড-শেডিং দুপুরের ঘাম ও অফিস সত্ত্বেও শেষ হলো। অর্থাৎ কবিতাগুলো যেন ঘাড় ধরে পড়িয়ে নিল। মনে হল কিছু মন্ত্রের গভীর থেকে অন্য এক আমি ধীর পায়ে বাইরে এসেছি। হ্যাঁ, বাইরে এসেছি। যে আমি নিঃসঙ্গতা, প্রবাস-গ্লানির আত্মনির্যাতন সম্পর্কে আজ সম্পূর্ণ উদাসীন। তার কারণ, এমনও কি হতে পারে বহুদিন তেমন তরুণ কারো উত্তীর্ণ কবিতা নেই, কবিতা বিষয়ক আলোচনা নেই, মূল অর্থে কবিতাই নেই। সেই কারণেই এই ভাললাগার তীব্র কবিতাগুলি আমাকে শিশুর মত লালায় ভরে দিয়েছে। মাতৃ জঠরের বাইরে আমরা যারা এর মধ্যেই বেশ কিছু দীর্ঘ বছর কাটিয়ে ফেলেছি; শিশুর লালা ভরা আদরেই মাতৃ জঠরের সেই নিগূঢ় অনুভূতি কিঞ্চিৎ ফিরে পাই মাত্র!

আমি সত্যিই বিস্মিত। বিস্ময় তো তাকেই বলি যা আমার অনুভূতিতে আগে কখনো ধরা পড়ে নি। এবং বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে এক অপরিচিত কবির সম্ভাবনার, ভবিষ্যৎ পরিণতির ইঙ্গিত আমার চোখে ধরা দিল।

দুই ॥

এতক্ষণ যে চৈতন্য-বন্দনা করছিলাম তার নায়ক কবি জয় গোস্বামী। কবি এবং কবিতা দুই-ই আমার অপরিচিত। তার কিছু কবিতার সঙ্গে সদ্য পরিচয়ের কথা আগেই বলেছি। সময় সময় পত্র-পত্রিকায় আমরা যখন কবিতার অংশে চোখ রাখি, তখন যে কারণেই হোক রেলগাড়ির জানালার চলমান দৃশ্যপটের মত—আকৃষ্ট করলেও সেখানে কিছু বেশী সময় দাঁড়াতে পারি না। কেননা পরবর্তীতে আবার আকৃষ্ট হই—এবং তার পরবর্তীতে, এইভাবে পত্রিকায় কবি-চিহ্নিতকরণ সাধারণত বিস্মৃতির কা.ছ চলে আসে। সেই ভাবেই এই কবির কবিতাও অতি অল্প আগে আমার চোখে পড়েছে। পড়েছি, ভালো লেগেছে—এইমাত্র, কিংবা ভালো লেগেছিল কিনা—তাও ঠিক মনে ছিল না। সম্প্রতি তার গ্রন্থ দুটি পড়ে সত্যিই অবাক হলাম!

আমি 'জতুগৃহ' থেকে ভ্রূণ' পর্যন্ত সবকটি কবিতা পড়লাম একটি একটি করে। কোথাও মনে হল না গ্রন্থে এই কবিতাটি না থাকলে ভালো হত। পড়ার শেষে, বা! বেশ! বলতেও সাহস হয়নি। বোঝা না বোঝার এক অত্যাশ্চর্য ভালোলাগা আমাকে থামিয়ে রেখেছে। যা বুঝিনি তাকেও বাতিল ঘোষণা করতে পারিনি। মনে হয়েছে এগুলো আমি বুঝতে পারছিনা, অন্য কেউ বুঝবে। যা বোঝা গেল না তা অতি অল্প অংশ মাত্র, যা গেল সেটাই প্রায় সবখানি। কোথাও কিন্তু অপরিণত বলে মনে হলনা!

প্রথম গ্রন্থটিতে সবকটিই সনেট, একটি ছাড়া। দ্বিতীয়টিতে সবকটি কবিতাই নাতিদীর্ঘ।

তীরভূমি জলে ওঠে। প্রৌঢ়তা, ধাতুর টুকরো সম্পূর্ণ চুম্বকে তুলে দেখি শমী আর শ্যামল ধনুক, ভস্ম, অবশেষে ক্ষুধা! এমনি পংক্তিগুলিকে এক প্রবীণ অভিজ্ঞতার জীবনবোধ বলতে আমাদের কোথাও আপত্তি থাকেনা, কবি যদিও বয়সে অতি তরুণ; যদি তারুণ্য অভিজ্ঞতার প্রাচীর হয়ে ওঠে, তবে বলতেই হবে কবি জয় গোস্বামী খুব সহজেই সেই প্রাচীরের ইট কটি খ.সয়ে জীবনবোধ আর প্রজ্ঞার কাছাকাছি একটি রাস্তা বানিয়ে নিয়েছেন।

'প্লুতস্বর', 'শীতঘুম', 'ক্রোরপক্ষী', 'শ্মশ্রুময়'। 'অপস্বপ্ন', 'জন্মপত্র' আর 'ক্রীসমাস'—এই নিয়ে প্রথম গুচ্ছ।—এই গুচ্ছের কবিতায় কবির প্রবাসের দিকটাই প্রধান হয়ে উঠেছে; তবে পূর্ববিংশতিবর্ষের মধ্যে রচিত প্রথমগ্রন্থের কবিতাগুলিতে কবির কবিস্বর কিছুটা ফর্মাল লাগে। যদি সনেটের নেমপ্লেট না থাকত তবে

অসুবিধে ছিলনা। কিন্তু সনেটের যা প্রধান গুণ—অনেক কথা অল্পকরে এনে সুগৃহিনীর মত আরও ছোট একটা কাঠামোর মধ্যে কিছু অক্ষরকে সাজিয়ে তোলা—যা কিনা শব্দ-ধ্বনি-ছন্দ-সম্বন্ধ কবিতার সম্পূর্ণ গুণের আধার হয়ে উঠবে—এই সনেটগুচ্ছের মধ্যে তা প্রায় অনুপস্থিত যদিও কবিতা হিসেবে এতগুলি ভালই। মনে হল, কিছু অনাদর, এবং ক্ষিপ্রতার দোষে অসামান্য কিছু পংক্তি সম্পূর্ণরূপে সনেট হয়ে উঠল না।

কিন্তু তারপরই দ্বিতীয় গ্রন্থের গুচ্ছ যা প্রথম গুচ্ছের পরবর্তী সময়ের রচনা, কিন্তু ব্যবধান খুব বেশী নয়। না হলেও এরই মধ্যে এক আশ্চর্য ক্ষমতায় কবি শক্তিমান। তার যে কোন আঁচরই এক একটি আশ্চর্য কবিতা রচনায় সিদ্ধ হয়ে উঠেছে। এমনি একটী কবিতার নাম "বকুল বাগান"!

—'জ্বলে উঠল বাড়ি, আমি
কি ঘুমোতে পারি
ও যে বলল—'কী আছে তোর দে'।
আমি ও ছোড়দি তখন
দুজনে দোর দিই
ভিতরে নেমে গহন প্রতিশোধের।
তারপর 'ভয় অনেক' এমন
বললেন সজ্জনে
কেউ ফেরালো ঘৃণায় মুখ, কেউ ফেরালো ক্রোধে—
'বয়সটা খুব খারাপ' তোমার
বলেছিলেন যাঁরা
তাঁরা কি যান বকুল বাগান রোডে!

কিংবা আর একটি কবিতা 'সাদা বিষ কালো বিষ'-এ লেখেন

'পোষা পাখিটির কালো চঞ্চুর
আঘাত লাগিয়ে তুমি চুর চুর
করেছ—তখনই গ্লেসিয়ার কি

কেঁপে উঠেছিল এ সমুদ্রে?
তোমার আগামী স্বামী পুত্রের

ভালো চাইবার বেশী আর কী
চাইতে পারবো আমি? তবু কে
নখর ছোঁয়ালো এসে ও বুকে?
রেখে গেল নীল দাগ দীর্ঘ?

অনবদ্য ছন্দ বিন্যাস এবং সাবলীল শব্দ ঝঙ্কারে পংক্তিগুলি এক কথায় চমৎকার। সতর্ক পাঠকের কানে হয়তো এক আধমাত্রার গোলমাল লাগলেও লাগতে পারে।

অনেকদিন আগে বোধহয় ১৯৫৪-৫৫তে, বাংলা কবিতায় দীর্ঘকবিতার পর্ব নতুন করে আবার সুরু হলো। প্রথমে ধারাবাহিকভাবে সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, পবিত্র মুখোপাধ্যায় তো বটেই; দীর্ঘ কবিতা লিখতে গিয়ে এমনকি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত একটি কালজয়ী কবিতা লিখেছিলেন 'কাল মধুমাস' নামে। তাছাড়া ইদানীং অনেকেই দীর্ঘ কবিতার পরীক্ষা নিরিক্ষা চালাচ্ছেন। এখনি কবি শঙ্খ ঘোষের দীর্ঘ দিন আগে লেখা একটি দীর্ঘ কবিতা 'দিনগুলি রাতগুলির' কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে।

প্রত্নজীব গ্রন্থের 'কালো ত্রিভুজের আস্তরণ' কবিতাটি কিঞ্চিৎ জটিল, কবি পাঠককে হাত ধরে অনেক অজানা জগতে নিয়ে গেছেন, নিয়ে গেছেন ছন্দ পরিবর্তনের আবহাওয়ায়। দীর্ঘ কবিতার ক্ষেত্রে 'পর্ব' ভাগ এবং ছন্দ পরিবর্তন অবশ্যই পাঠের একঘেয়েমি থেকে পাঠককে মুক্ত রাখে। জয় সার্থক ভাবে তা পেরেছেন।

এই কবির কাছে আমাদের অনেক আশা। অল্প পরিসরে রচিত যে কবিতা গুলি আমার হাতে এসেছে—তৃপ্তির চেয়ে তৃষ্ণাই বেশি জেগেছে তাতে। জয়ের আরো লেখা পড়তে চাই। এবং সবশেষে দ্বিতীয় গুচ্ছের শেষ কবিতার শেষের কটি লাইন উদ্ধৃত না করে পারছি না। যেমন—

'আরকের মধ্যে রয়ে গেছে ডুবে যাওয়া ফুল। ফুলে
শরীর গুটিয়ে নিয়ে শুয়ে আছে পতঙ্গ। মানুষ, পাখি আর উদ্ভিদের
মিশ্রিত শিশুটি।
তিন লক্ষ বছর পর তার বেরিয়ে আসবার কথা……!'

সময়ের মাপে সভ্যতার কী এসে যায়! আসলে পতঙ্গ মানুষ পাখি আর উদ্ভিদের সমৃদ্ধ পৃথিবীতে কবি আসুক আরো ক্ষিপ্র-দীপ্ত পায়ে।

নিচের দীর্ঘ কবিতাটিতে পাঠক জয়ের ব্যক্তিগত পৃথিবী ও মানসভূমির আরো ব্যাপক, আরো সার্থক সন্ধান পাবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

জয় গোস্বামীর দীর্ঘ কবিতা

নর্তক

কালো পাথরের পাশাপাশি আরো ঘন সাদা পাথরের
ধাপ উঠে গেছে স্তরে স্তরে আর তুষার এলাকা দুদিকে
তার শেষ মুখে শঙ্কু-আকৃতি চূড়ার উপরে এসে
নিকটবর্তী আকাশের যত বড় মেঘ ছোট মেঘ
ধাক্কা দিতেই ফেটে গেল শূন্যের ঐ ঢাকা

মেঘ ফেটে-গিয়ে দেখা গেল থাম, বড় বড় সারিসারি
ঝকঝকে সাদা পাথরের টানা শানে
লাফিয়ে পড়েই দ্রুত ভেঙ্গে যায় ছোট ছোট গোল আলো
আর চারিদিকে জেগে ওঠে দ্রুত নূপুর, নূপুর জাগছে
সাদা মার্বেল চৌচির করে কালো পাথরের নর্তক

উঠে এল, ধোঁয়া-কালো কাঠিন্য, সুঠাম দীর্ঘ ঘনতা
জেগে ওঠে দোলে নিটোল স্তব্ধ পেশীতে
বাহু আর কাঁধে ; জানুর দৃঢ়তা কাঁপছে
খুব ধীরে ধীরে ঘুরে যায় মূর্তিটি
ক্রমশই কালো চওড়া প্রবল পিঠ
বড় হতে থাকে, ক্রমশ চওড়া হতে হতে অবশেষে
হঠাৎ-ঝলকে পাথুরে দেওয়াল ফাটিয়ে
উঠে এল এক লকলকে শিখা, দাউদাউ—
তিন মুহূর্ত, তারপরই মুছে গেছে
আগুন নিভতে ছাই নেই আর পাথুরে দেওয়াল নেই
শুধু দুই দিকে ছড়ানো শূন্য, শুধু দশ দিকে ছড়ানো
বিরাট একটা কালো দশ দিক, মাঝে মাঝে বিন্দুরা
টুপটুপ করে জ্বলছে, ঐ তো নিকটে একটা বর্তুল
আলোর গোলক, মাঝারি মতন, ছুটন্ত, গ্যাসভরা—
হঠাৎ একটা অতিকায় গোল পিণ্ড

এগিয়ে আসছে বিপরীত দিক থেকে…
হাহা ঝড় ওঠে, আগ্নেয় ঝড়, প্রচণ্ড টান, ঝাঁকুনি
অতিকায় বড় গোলকটা ঐ দূর দিয়ে যেতে যেতে
ছিঁড়ে নিয়ে এসে ফেলে গেল ফের আরেকটা গোল বল
বলটা ঘুরছে, ঘুরতে ঘুরতে ছোট বড় সব জলন্ত লাল টুকরো…

দুইদিকে সেই ছড়ানো শূন্য, সেই দশদিকে ছড়ানো

কই ?

ক্ষীণতর নদী, বটগাছটাকে ডানদিকে রেখে দিয়ে
একটু গেলেই ছোট মন্দির, সিদ্ধেশ্বরীতলা
বউরা চলেছে দলে দলে সব নীলপাড় সাদা শাড়ি
কারো বা গরদ, হাতে ছোট থালা—আজ মঙ্গলবার

দরজার কাছে পাড়ার ছেলেরা, বিলু আর পল্টু,
মন্দির থেকে বেরোবার পথে সাদা চুল রাঙা দিদু
ওদের দুটিকে চিনি সন্দেশ আধখানা করে দেন
ছোট্ট রাস্তা, শান্ত ও নির্জন,
রাত্রি হয়েছে, একটু আগেই একজন পথচারী

একা হেঁটে যায়, হঠাৎ একটা কালো ও লম্বা ছায়া
ছুটে বেরিয়ে এল ওপাশের গলি থেকে
চাপা চিৎকার, দুপদাপ চোরা দৌড়,
লোকটা এখনো নড়ছে একটু– দাও গো
ওর মুখে কেউ জল দাও—
পিচের উপরে ঘন লাল, চটচটে

রক্তের ধারা বয়ে গেছে, গিয়ে মিশেছে নোংরা ড্রেনে……
সাইরেন দিয়ে চলে গেল দুটো পুলিশের গাড়ি, আর
থানার ওপাশে গড়িয়ে পড়ল একটী তরুণ শরীর
ছোট্ট একটা ফুটো তার পিঠে ওর মা-কে আমি চিনি…
সমস্ত দেহ নগ্ন এবং হাত দুটো রিং-এ ঝোলানো
চুলগুলো ভিজে গিয়েছে রক্তে ডান চোখ ফুলে উঠে

ঢেকে গেছে পুরো, এছাড়াও গায়ে বহু দাগ টানা টানা
আরেকটা দেহ শূন্যে ঝুলছে ২৫শে জুলাই ভোরে
কে গো ? কৃষ্ণাণ চেটি ?

কার কাছে আসি ? আমি কার কাছে আসি ?
এ বাড়িতে এত লোক, তাও আমি কান রাখি সারাক্ষণ
কখন একটু শব্দ উঠলো দরজায়
অথবা কখন পড়া ছেড়ে উঠে এসে
রেলিঙের কাছে দাঁড়ালে একটু, অথবা আস্তে ওপাশের ঘরে গেলে

তখনই ওঘর থেকে ভেসে এল চা করার ছোট শব্দ
চামচের ধ্বনি, দৌড়ের আওয়াজ, কাপডিশগুলি নামিয়ে রাখার গান
কার হাত ফসকে পড়ে গেল যেন বিস্কুটভরা টিন
দরজার কাছে রিনিঠিনি ছোট ভাইকে চাপা ধমক
এত লোক এত লোক এ বাড়িতে, আমি কার কাছে আসি ?

সলতের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে আগুন
দৌড়ে পালাল তিনজন মজুর
পাহাড় ফাটছে, ডিনামাইটের হাওয়া—
ধোঁয়া ঘিরে এল, ধুলোয় ধুলোয় কিছু দেখা যায় না
একটা পাথর উঠে গেল শূন্যে—

আর সে পাথর শূন্যে উঠেই হলুদাভ-লাল গোলা
গনগনে লাল উড়ে যায় একি লালগ্রহ মঙ্গল ?
ধোঁয়ার মতন আকাশ, বাঁকানো চওড়া বিরাট খাল
সামনের দিকে বহুদূর গিয়ে ঘুরে গেছে ধূ ধূ শুকনো,
কোথাও কোথাও ছোট ছোট ঝোঁপ, দু-একটা উদ্ভিদ
উদ্ভিদগুলো মাঝে মাঝে বুকে হেঁটে
সরে সরে যায় একে অপরের দিকে
স্থির এঁটে বসে, তারপর দুটি থেকে

একদিন জেগে উঠে মাথা তোলে তৃতীয় একটি উদ্ভিদ
আরো কিছুদূরে তেলের মতন টলটলে লাল তরল
তাতে ভাসমান গোল মতো দুটি অতি ছোট ছোট প্রাণী
ভাসতে ভাসতে পরস্পরের দেহে এসে আটকালো···
নগ্ন স্থঠাম যুবকটি—তার ঘন গতিশীল শরীরের তলা থেকে
মেয়েটি কাঁপছে দমকে দমকে 'মারো, মেরো ফ্যালো, মারো না !'
পৃথিবী দুলচে বিস্ফোরণের আগে···

মাটি কেঁপে ওঠে, গুরুগুরু ধ্বনি, পাহাড়ের মাথা থেকে
চুড়ো উড়ে গেল, গলগল করে ধোঁয়া
পালাও পালাও, পাথর ও পোড়া গন্ধক
লাফিয়ে পড়ছে শহরের কালো আকাশে এবং মাটি ফেটে যায়
ফুঁড়ে ওঠে জল, গরম বাষ্প, ফোয়ারা···

শান্ত, স্তব্ধ চুরমার বাড়ি, ভেঙ্গে পড়ে যাওয়া থাম
এখানে ওখানে মৃতদেহ আর লাভা গন্ধকে ঢাকা
সারাটা শহর, উপড়ানো গাছ, উড়ে আসা কড়ি বরগা,
ঐখানে বুঝি মাটি ফেটে গিয়ে বুজে গিয়েছিল তখনই
একটা মানুষ অর্ধেক ডুবে স্থির চেয়ে আছে সামনে···

বড় বড় গাছ ঘিরে আছে দীঘি, সিঁড়িতে একটি কলসী
কে যেন আগুন জল ঝরা গায়ে তার স্নান শেষ করে
উঠে এল পাড়ে - কটিমাত্রও বস্ত্রাবৃতা নয়—
এই পৃথিবীর সবচেয়ে ঘন ফুটন্ত ভাস্কর্য্য
দেখবার আর কেউ নেই শুধু পথ ভুল করে হঠাৎ এসে পড়া হাওয়া
কী লজ্জা বলে ফের পালিয়েছে গাছে গাছে ঝিরিঝিরি···

রোয়াকে ছেলেটি একা ঘুমোচ্ছে, ছেঁড়া হাফপ্যাণ্ট পরা
ওদিকে লতানো বিতান উঠেছে পাঁচিলের গায়ে গায়ে
উপরের ঘরে আলো জ্বলে ওঠে, সারি সারি খোলা জানলা

উঁচু উঁচু ক্রেন, জালঘেরা লিফট
নেমে যায় আরো কালোর ভেতর, ভারি ভারি হেলমেট,
নিরন্ধ্র কালো দেওয়ালের দেহ থেকে
ঝরে পড়ে কালো, গুঁড়ো গুঁড়ো আর কখনো বিরাট চাঁই
'তোমাকে আজকে হাওয়ায় হাওয়ায় চাই'
কাকে চাই ? কাকে ? কাউকেই নয়। বাজে কথা ছেড়ে দিলে
প্রকৃত বাতাস কারো কাছে নেই, বাতাসের ভাগ আছে—
আর আছে কোটরে ওৎ পাতা গ্যাস, নিঃশ্বাস চেপে ধরা,
এরই মাঝখানে হেলমেটে আলো, কয়লা ফাটার শব্দ,
হঠাৎ কোথায় বিরাট আওয়াজ, পাতাল
নেমে যায় বুঝি আরো পাতালের কাছে
কলকল করে ঘিরে আসে জল, কালো জল, এত কালো……

জলের কিনারে সরু বেঞ্চ আর সন্ধ্যার পরে দুজনে
দুএকটি লোক, টানা গাছগুলি, তার ফাঁক দিয়ে দিয়ে
সারিসারি ট্রাম চলে গেল আলো জ্বালা
ছেলেটির খোলা জামার বোতাম নিয়ে
খেলা করে ঐ মেয়েটি চপল, ঝিরিঝিরি চুল কপালে…

যা দিয়েছ তা তো কোণের চেয়ারে সারাদিন
যা দিয়েছ এই তাকে কিছু বই, ছোট নাটকের দল
বাড়ির কাছে একা-লাইব্রেরী, পুকুর পেরোনো রাস্তা
যা দিয়েছ তা তো ষ্টিমারের ভেটি, মুদুল কোথায় মাসীমা
সেই হুট করে কিছু না জানিয়ে ভোরবেলা গৌতম

যা দিয়েছ তা তো রাতে ঘুম ভেঙে তোলপাড় করা বৃষ্টি
আকাশ ভরিয়ে মায়া গাইছেন রিমিকিঝিমিকি ঝরে…
ধূ ধূ বালি আর বালির উপরে আরো আঁধিঝড় তুলে
ঐ দূর থেকে এগিয়ে আসছে তিন বেদুইন সওয়ার
কিন্তু এরা কে ? আমাদের এই ছোট্ট শহরে
মরু কোথা থেকে এল ?

পরক্ষণেই মরু নেই শুধু চারিদিকে নীল জল
দুখানি জাহাজ বড় পালতোলা দুলছে অনেক দূরে
না। অনেক কাছে। লাল চুল দাড়ি, বেলটে লাগানো পিস্তল
বিরাট একটা কামানের মুখ ওরা ঘোরাতেই গোলা
ছিটকে এসেছে, ফেটে গেছে আর সঙ্গে সঙ্গে—এই তো !
এই তো আমার বাড়ি ও শহর ! এই তো পৃথিবী গ্যাসীয়, তরল, কঠিন—
দুলে ওঠা জল, আগুন, তুষার, অ্যামিবা ও ডাইনোসর
ঠিক ঠিক বাঁধা— কেউ ঘুমন্ত, কেউ জেগে আছে আর
ঐ দূরে দূরে লাল সাদা গ্রহ বুধ কি শুক্র, মঙ্গল…

আর ঠিক এর কেন্দ্রকে ভেদ করে
দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো পাথরের নর্তক
তাকে ঘিরে আছে দলবেঁধে যত বড়মেঘ ছোটমেঘ
তারই মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে শত শত ঝাড়লণ্ঠন
দশদিক ভরা কালোর ভেতর হু হু করে উড়ে যাচ্ছে……

শিল্পভাবনা

সাম্প্রতিক সময়ের তিনটি নাটক

নৃপেন্দ্র সান্যাল

দিনকয়েক আগে অনুষ্ঠিত সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের আসরে বিলায়েৎ খাঁ মন্তব্য করেছিলেন : এমন সমঝদার আর কোথাও নেই, এমন সঙ্গত আর কোথাও নেই, তাই আর সমস্ত বাজানোর আহ্বান বাতিল করে দিয়ে কলকাতাতেই বাজাতে আসি। কলকাতায় বাজাতে আমার মন লাগে। কথাগুলি উপস্থিত শ্রোতাদের খুশি করার জন্য বিলায়েৎ বলেন নি। এমন কথা এর আগেও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কলকাতার শ্রোতা এবং দর্শকদের সম্পর্কে বলেছেন। কিছুকাল আগে দিল্লীর জাতীয় নাট্য সংস্থা কলকাতায় এসেছিলেন এবং সাফল্যের সঙ্গে তাঁদের তিনটি নাটক এখানে পরিবেশন করেন। তাঁদের এক কর্মকর্তাও ঠিক একই কথা বলেছিলেন। 'এখানে তারিফ পেলে বুঝব আমাদের প্রযোজনা ও পরিবেশন ঠিক ঠিক হচ্ছে।'

কথাগুলি যে মিথ্যে নয় তা কলকাতার সাম্প্রতিক নাট্য আন্দোলনের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তর উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার নাট্যগোষ্ঠীগুলি একটি প্রশংসনীয় মানে স্থিত হয়েছে। এর মধ্যে দুএকটি পেশাদার নাট্য সংস্থাও সার্থকতায় সমৃদ্ধ।

অবয়ব একটি নতুন নাট্য সংস্থা। অভিনয়-নিপুণ কয়েকজন শিল্পী, সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এক চিত্র পরিচালক—এঁদের যৌথ প্রয়াসে গড়ে উঠেছে এই নাট্য গোষ্ঠী। এঁদের প্রথম নাটক গিরিশ কারনাডের 'হয়বদন'। টমাস মানের রচনার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় ঘটেছে অনেককাল। এবং মানের 'ট্রান্সপোজড হেডস' গল্পটিই গিরিশ কারনাডের রচনার সূত্র। মানুষের সম্পূর্ণতা শুধু কি তার মস্তিষ্কের গুণেই, না-কি শুধু শরীরের। এই দুই-এ মিলে মানুষ। এ প্রশ্নের

সমাধান করার ধৃষ্টতা গিরিশ কারনাড দেখান নি। এমন একটি জটিল সমস্যা কয়েকটি নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করে, হাস্যরসের অবতারণা করে, অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তিনি উপস্থিত করেছেন। নাটকের বিন্যাস, চরিত্রের প্রতিফলন এর সব কিছুর মধ্যেই এক আপাত-লঘু হাস্য পরিহাসের কথনো বা ফ্যানটাসির অন্তরালে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে দেহ-মনের মূল দ্বন্দ্ব উপস্থিত করেছেন।

নাটকের মুখ্য চরিত্র তিনটি। দেবদত্ত, পদ্মিনী ও কপিল। কিন্তু এদের সমস্যাগুলি বুঝিয়ে দেবার জন্য ব্রেশটের অনুসরণে আর একটি চরিত্রের সংযোজনা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। চরিত্রটি অধিকারীর। এই নাটকে এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ! তিনটি ভাগে নাটকটির যে বিন্যাস ঘটেছে, অধিকারী তাদের মধ্যে এক যোগসূত্র স্থাপন করেছে। পাশাপাশি আরো একটি চরিত্র 'হয়বদন', তার আজন্ম সঞ্চিত সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা করতে হয়েছে স্বয়ং এই অধিকারীকে।

পদ্মিনীকে দেবদত্তর কাব্যচিন্তা মুগ্ধ করেছে। কিন্তু কপিলের দেহের ঘ্রাণ, তার আকর্ষণ আরো দুর্বার। সহজেই অনুমেয়, দেবদত্তর কবিত্ব, চিন্তা এবং কপিলের শরীর নিয়ে যদি তৈরী হত এক মানুষ—পদ্মিনীর কাছে তা অপেক্ষা আর কিছু কাম্য হতে পারেনা। এতে পদ্মিনীর দ্বিচারিণী মন মুক্তি পাবে, তার ক্ষোভ আর হিংস্র হয়ে উঠবে না, তার স্নেহ, মমতা শরীরের গণ্ডি পার হয়ে প্রকাশ পাবে। ঘটলও তাই, কিন্তু পদ্মিনী তা থেকে মুক্তি পায়নি। যেমন পায়নি হয়বদন। তার মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল না। জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে গেয়ে তার পরিপূর্ণ মানুষের স্তরে উন্নীত হবার চেষ্টা সফল হল না। তার কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত হ্রেষা ধ্বনিতেই ফিরে গেল।

এমন একটি দুরূহ এবং জটিল বিষয় নাটকে উপস্থিত করা নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের। পরিচালক এখানে সমস্ত বিষয়টি অযথা ভারাক্রান্ত না করে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কৌতুক এবং গানের উপস্থিতি ঘটিয়ে সমস্ত নাটকটিই রসে ভরপুর করে তুলেছেন। মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া গান নাটকের বড় সম্পদ। মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনী এমন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে তার কারণ, চরিত্রটি তিনি যথাযথ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। বিশেষ করে কপিলের দেহের প্রতি তার লোভের মুহূর্তগুলি এমন সাবলীল, এমন স্বচ্ছন্দ যা মনে হয় সমস্ত নাটকটি সম্পর্কে তাঁর পরিপূর্ণ বোধ-এরই প্রকাশ।

এই নাটকে বিশেষ করে যার অভিনয় অত্যন্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে, তিনি

হলেন অধিকারীর ভূমিকায় মৃগাঙ্কশেখর রায়। তাঁর অভিনয় চোখে পড়েনা। এবং এই চোখে না পড়ার প্রধান কারণ চরিত্র সম্পর্কে মৃগাঙ্ক শেখর রায় সব সময়েই সচেতন। যেটুকু ত্রুটি চোখে পড়ে, তা মেক-আপের। অভিনয়ের নয়। তাঁর ভূমিকায় নাটুকেপনার অবকাশ নেই, বিশেষ নাটকীয় মুহূর্তেও তাঁর আবির্ভাব ঘটেনি। তাঁর কাজ ছিল যোগসূত্র স্থাপনের। এক অর্থে তিনি নেপথ্য সঞ্চারি। আর একাজ তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে করেছেন। সমস্ত নাটকটিকে আমরা যদি একটি সিম্ফনীর সঙ্গে তুলনা করি, তবে তাঁর ভূমিকা সেই স্বল্প-উচ্চারিত কর্ডের সঙ্গে তুলনীয়। যার ব্যঞ্জনা ছাড়া অন্যান্য কর্ডের উচ্চগ্রামে ওঠা কখনই সম্ভব নয়।

দ্বীপান্বিতা রায়ের কালি, কতটুকু সময়ের জন্যই বা তিনি মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু এই নাটক প্রসঙ্গে এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে ভোলা সম্ভব নয়। এঁরা ছাড়া অন্যান্য চরিত্রেও সকলের অভিনয় প্রশংসনীয়।

নাটকটির অনুবাদ করেছেন শঙ্খ ঘোষ। বলার অপেক্ষা রাখেনা, এই নাটকের সাফল্য অনেকখানি তাঁর অনুবাদের কারণে।

* * *

একটি অবাস্তব বক্তব্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার দুরূহ চেষ্টা সেই সঙ্গে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার দুরপনেয় ভণ্ডামির চিত্রটি তুলে ধরা যতই কষ্টসাধ্য হক না কেন, বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী কিন্তু সেই দুরূহ প্রস্তাবনাকে কাজে লাগিয়ে সচেষ্ট হয়েছেন। ফলে দৃশ্য সজ্জা, রঙের জৌলুষ অথবা আলোর বিচিত্র ব্যবহার, যা অনায়াসেই দর্শকের দৃষ্টি বস্তু অপেক্ষা বস্তুর আধারে টেনে নিয়ে যায়, অধুনা পরিত্যক্ত। দৃশ্যান্তর ঘটে কয়েকটি প্রতীকের ব্যবহারে।

থিয়েটার ওয়ার্কশপের মহাকালীর বাচ্চা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নাটকটি রচনা করেছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। তিনি বিমূর্ত নাটক, (নাকি বলা ভালো, বাস্তবোত্তর!) রচনায় খ্যাতিমান। মনে পড়ে নক্ষত্র নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় তাঁর এমনই কয়েকটি নাটক এককালে দর্শকমনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ভাবের দিক থেকে এই নাটকটিও তাঁর পূর্ব খ্যাতির পরিপূরক। কিন্তু কল্পনাকে কতদূর প্রসারিত করা যায়, সে সম্পর্কে নাট্যকারের কিছুটা উপলব্ধি থাকা বোধ করি সঙ্গত। আহারবঞ্চিত, মস্তিষ্কবিকৃত হারাণ মিস্ত্রীর বৌ-এর কালী-রূপে আবির্ভাব এবং ক্রূর ও শঠ মহাজন ইন্দুশেখরের তা দেখে মায়ের জাগ্রত মূর্তি ভেবেই বিহ্বলতা ও সামান্য পরে আবিষ্কার যে ওই উন্মাদিনী মায়ের সোনার

গহনা নিয়ে পলায়ন করেছে, ভাত না পেয়ে বাচ্চা শিশু নরমাংস ভক্ষণ করেছে এবং রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শালবনের ডাল নড়ার শব্দে ইন্দুশেখরের আতঙ্ক—এই সবগুলি মনে হবে বিচ্ছিন্ন ঘটনা—কিন্তু এদের এক সূত্রে গ্রন্থন করে সমগ্র ঘটনা-বলীকে অর্থবহ করে তোলার দায়িত্ব যিনি নিয়েছিলেন সেই বিভাস চক্রবর্তী কিন্তু আশ্চর্য প্রয়োগ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন এই নাটক নির্দেশনার কাজে। এ কাজ মোটেও সহজ ছিল না। তীব্র বিদ্রূপ, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, কোথাও কটাক্ষ এবং সর্বোপরি কোরাস গানের মাধ্যমে নাটকীয় সংঘাত সম্পর্কে দর্শক মনের প্রস্তুতি-প্রয়োগ নৈপুণ্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

নাটক প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে ইন্দুশেখর-এর ভূমিকায় অশোক মুখোপাধ্যায়-এর সপ্রতিভ, দৃঢ় এবং চরিত্রানুগ অভিনয়। এই চরিত্রের শঠতা, নিষ্ঠুরতা এমন নিলিপ্ত মেজাজে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তা যে-কোনো অভিনেতার পক্ষেই ঈর্ষার বিষয়। রমাবাই দে-র এই নাটকে বিশেষ কিছু করার ছিলনা, তবে কোরাসের মুখ্য ভূমিকা তিনি যথাযথ পালন করেছেন। শুধু প্রশ্ন হয়, তাঁর ওই সামান্য নৃত্যাংশটুকু কি খুবই প্রয়োজন ছিল! ক্ষেতুর ভূমিকায় অঞ্জন দেব আর একটি প্রশংসনীয় নাম। কিন্তু 'চাক ভাঙ্গা মধু' থেকে শুরু বিভাস চক্রবর্তীর এ ধরনের ভূমিকাকে সেই একই ধরনের টাইপ চরিত্রে প্রসারিত করা কতখানি যুক্তিগ্রাহ্য—সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। মাণিক রায়চৌধুরীর মত এমন শক্তিশালী অভিনেতার আরো কিছু ভালো করার সুযোগ পাওয়া উচিত ছিল। (থিয়েটার ওয়ার্কশপের প্রযোজনায় 'পাচু ও মাসী' নাটকে তাঁর অভিনয় কে ভুলতে পেরেছেন?)

* * *

নাটক পরিবেশনের ক্ষেত্রে পেশাদার ও অপেশাদার এই দুই বিশেষণ প্রয়োগ সম্পর্কে বোধহয় চিন্তা করার সময় এসেছে। কারা পেশাদার এবং কারা অপেশাদার, এ সম্পর্কে কি কোনো নির্দিষ্ট অভিধা কেউ নিরূপণ করেছেন। এ যেন কলকাতার মাঠে প্রথম ডিভিশনে ফুটবল খেলা। যদি অর্থ উপার্জনকেই মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়—তবে বোধকরি অপেশাদার শব্দটির ব্যবহার অতিরিক্ত বলেই মনে হবে। (পাড়ার ছোটো ছোটো নাটকের দল বা অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাটক অবশ্য এ প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়।)

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত, পরিকল্পিত এবং রচিত নাটক 'নাম জীবন' এই কারণেই আলোচ্য।

'নাম জীবন' বারো ঘর এক উঠানের মতই এক পটভূমিতে নির্মিত। কলকাতারই কোনো নিম্নমধ্যবিত্ত অঞ্চলের একটি বাড়ির কয়েকটি পরিবারের দুঃখ, বেদনা, হতাশা এবং আশার এক চিত্র। নাটকটি একটি নির্দিষ্ট স্বরগ্রামে বাঁধা। কিন্তু কোথাও তাকে উচ্চ অথবা নিম্নগ্রামে তুলে কিম্বা নামিয়ে অযথা নাটুকেপনার সৃষ্টির চেষ্টা হয় নি কোথাও কোনো বিমূর্ত সঙ্কেতের ব্যবহার নেই। কোথাও বাস্তবোত্তর কোনো পর্যায়ে দর্শকদের পৌঁছে দেবার চেষ্টা নেই। কয়েকটি ঘটনাকে এক সঙ্গে গ্রথিত করে সাধারণ বুদ্ধিগ্রাহ্য করে একটি নাটক পরিবেশন করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। শুধু নাটকের শেষ অংশে 'বাস্তব ও সত্যের' এক বহু বিতর্কিত প্রশ্নে তিনি এসে পৌঁছেছিলেন, এবং অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে তিনি 'সত্য' প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এই নাটকের সব থেকে উল্লেখ্য বিষয় হল দ্বিস্তর মঞ্চের পরিকল্পনা। এবং ওপরের দিকের একটি ঘরের বাসিন্দা বিশ্ব। (জানিনা, এটি হঠাৎ হওয়া—না চিন্তা প্রসূত। কারণ প্রথমদিকে নিচুতলার অধিবাসীদের দিকে, সহজাত মানবতাবোধ সত্ত্বেও কি একটু অন্যদৃষ্টিতে বিশ্ব তাকায়নি?) নিচুতলায় বাসিন্দা রুনি, অমরনাথ, বাসনা এবং একটি শিশুর ছোটো সংসার, তার পাশেই নমিতা, যাকে জীবিকার জন্য বহু মানুষের আতিথ্য কামনা করতে হয়, অথচ এক আপাত বিশ্বাসে সে খুশি থাকতে চেষ্টা করে যে এই অতিথিদেরই অন্যতম রাজা একদিন না একদিন তাকে বিয়ে করবে। আর কলতলার পাশ কাটিয়ে গেলেই যে ঘর—সে ঘরে থাকে বাণী। নেপালবাবুর কারখানায় চাকরি করে। আত্মসম্মান বাঁচিয়ে রাখতে বোধ হয় তার সব শক্তি শেষ হয়ে যায়।

বিশ্ব ঠিক করেছে, দেশ ছেড়ে চলে যাবে। ভালো মেকানিক সে। ভাো রোজগার করে বাণীকেও সে নিয়ে যাবে। কি হবে এই দেশে থেকে; কেই বা আছে তার। ছোটো ভাই নকশালপন্থী, তাকেও তো পুলিশ গুলী করে মারল। কিন্তু বিশ্বর এই সংকল্পে চিড় খেল। দেশ ছেড়ে সে গেলনা, বাণী, বাসনা, রুণি, অমরনাথ, যার বিরুদ্ধে তখন চুরির মামলা ঝুলছে, এদের নিয়েই, এদেরই দুঃখ, কষ্টের সঙ্গী হয়ে বেঁচে থাকতে চাইল।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ের প্রশংসা করতে গিয়ে যাই বলা হোক না কেন, মনে হবে যেন যথাযথ হলনা। সেই সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় বাসনার চরিত্রে নীলিমা দাসের। এই দুটি নামের উল্লেখের অর্থ এই নয় যে—আর যাঁরা অভিনয়

করেছেন, অর্থাৎ লিলি চক্রবর্তী (বাণী), স্বর্ণালী গাঙ্গুলী (রুণি) সুচেতা দাস (নমিতা) তাঁদের ভূমিকা প্রশংসনীয় নয়!

কিন্তু সব ছাড়িয়ে যাকে সাধুবাদ জানাতে হয় তিনি স্বয়ং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। রচনা, পরিচালনা, প্রয়োগ কৌশল এবং সেই সঙ্গে অভিনয়—বাংলা নাটক সম্পর্কে আমাদের প্রত্যাশাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছেন।

প্রথমে যা বলেছিলাম, আবার সেই কথায় ফিরে যাই। দিনানুদৈনিক এত রকম অসুবিধা, তা সত্ত্বেও কলকাতার আবহাওয়া এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনে আমাদের আশান্বিত করে তোলে।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

সবিনয় নিবেদন,

বিভাবের পরপর কটি সংখ্যায় বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। যাদের হাতে শিক্ষাব্যবস্থার ভার এতে তারা কতটুকু সচেতন হবেন জানিনা। তাছাড়া তাদের বিভাব পড়বার সময় কোথায়? কিন্তু অনেক নতুন তথ্য, যা সংবাদপত্রে সাধারণত প্রকাশিত হয়না, তা জেনে উপকৃত হয়েছি। বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় সুপ্রিয় ভট্টাচার্যের "আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ ও তার প্রতিকার" প্রবন্ধটির। জানিনা এমন সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ, প্রতিটি স্তরে এত তথ্য ও পরিসংখ্যাননির্ভর রচনা এর আগে প্রকাশিত হয়েছে কিনা! বেশীর ভাগ প্রাবন্ধিকই গলদ দেখিয়ে বাহবা পান। কিন্তু প্রতিকার নির্দেশ করার সাহস ও যোগ্যতা থাকে ক'জনার? সুপ্রিয়-বাবুকে ধন্যবাদ তিনি ত্রুটি দেখিয়েই ক্ষান্ত হন নি, প্রতিস্তরে সরকারের নিজস্ব তথ্য উদ্ধৃত করে একটা সত্যিকারের সমাধানযোগ্য সূত্রও নির্দেশ করেছেন। এমন কি শিক্ষাখাতে খরচের একটি বাজেটও তৈরী করে দিয়েছেন। নিজে অর্থনীতির অধ্যাপক হিসাবে বলতে পারি এমন গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন অর্থহিসাব রচনা করতে পারলে পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন প্রাজ্ঞ অধ্যাপকই নিজেকে ধন্য মনে করতেন। উনি কি করেন জানতে পেলে (ব্যক্তিগত জীবনে ডঃ সুপ্রিয় ভট্টাচার্য ধাতুবিজ্ঞানের একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, সাহিত্য শিল্প কবিতারও একজন কাছের মানুষ সম্পাদক) সুখী হবো।

ইতি

অধ্যাপক সুবোধ রায়

মুর্শিদাবাদ

সম্পাদক সমীপেষু,

শিক্ষা শিক্ষা করে দেখছি আপনারা পাগল হয়ে যাবেন! রাজনৈতিক দলগুলোকে দেখে শিখুন না! স্বীকার না করে লাভ নেই নেতারা চাষীদের

দিয়ে শস্য বাড়িয়েছেন। জামাকাপড়? হুঁ তাও কিছুটা। অন্তত নিম্নাংগে কার্পাস নেই এ-রকম মানবক বহুদিন চোখে পড়ছে না। কিন্তু শিক্ষা? যেখানে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের খাদ্যের পরেই প্রথম প্রধান দাবী হওয়া উচিত সর্বস্তরে অ-বেতন শিক্ষার জরুরী প্রচলন, সেখানে তারা কি করছেন! করবেন কেন? জনসাধারণকে সর্বস্তরে শিক্ষিত করে তুললে তারা যদি জন-'অসাধারণ' হয়ে মৌরসী পাট্টা গেড়ে বসা ঠাকুর্দার বয়সী নেতাদের গদি থেকে তুলে দেয়!

যাকগে, একটাই অনুরোধ। সুপ্রিয়বাবুর প্রবন্ধটির মূল ইংরেজী (আপনারা বঙ্গানুবাদটা ছেপেছেন) ভাষ্যটী রাজ্য ও কেন্দ্রের তরুণ ও প্রথম-প্রৌঢ় বয়সের নেতাদের কাছে পাঠিয়ে দেখুন না! কিছু কাজ হবে কিনা জানিনা। তবে তারা যদি সেক্রেটারীদের দিয়ে না পড়িয়ে নিজেরা পড়েন, তবে আয়নার সামনে এসে একবার তাদের দাঁড়াতেই হবে!

ভবদীয়

মতিলাল রায়চৌধুরী

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদক সমীপেষু,

বিভাবের গত দুই সংখ্যায় রাধারমণ মিত্রের কোনো রচনা চোখে পড়লোনা। আমার এবং আমার মতো তার অসংখ্য ভক্ত পাঠক-এর তরফ থেকে তাকে নিয়মিত লিখতে অনুরোধ জানাবেন বিভাবে। এমন একজন গবেষক যে এখনো আমাদের মধ্যে আছেন এটা গভীর গৌরবের বিষয়। (রাধারমণ মিত্র আগামী সংখ্যায় বিভাবে আবার লিখবেন। মাঝখানে দীর্ঘদিন দুটি প্রকাশিতব্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরীতে তিনি ব্যস্ত ছিলেন— সম্পাদক)

নমস্কার নেবেন

অরুণ সেন

রাজেন্দ্রনগর, নিউদিল্লী।

সবিনয় নিবেদন,

H. M. V. যে তালিকা দিতে পারেনি তাই আপনাদের কাগজে পেলাম। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও পঙ্কজকুমার মল্লিকের স্বয়ংসম্পূর্ণ রেকর্ড তালিকার জন্য গৌরাঙ্গ ভৌমিক ও প্রদ্যুম্ন মিত্রকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাবেন।

ইতি

আলপনা রায়

গরিয়াহাট রোড। কলকাতা

মাননীয় সম্পাদক,

বিভাবের গত আটটি সংখ্যাই পড়েছি। না, ভাল, অসাধারণ, ঈর্ষনীয়, শব্দগুলি ব্যবহার করবোনা! কতগুলি ভাত না হজম হওয়া আলোচক ঐ সব শব্দগুলি থেকে সঠিক অর্থ অনেক আগেই নিংড়ে নিয়েছেন। যদিও এ কাগজ ক্রমশই আমাদের কতো প্রিয় হয়ে উঠছে শব্দগুলিতে তা বোঝানোও যেতো না। তবে সাধারণ মান উন্নত হওয়া সত্ত্বেও বিভাবের নির্বাচিত কবি ও কবিতাগুচ্ছ সম্পর্কে দু একটি কথা বলার আছে। যদিও যাদের কবিতা ইতিমধ্যে ছেপেছেন তারা সকলেই পরিচিত। কিন্তু তারা সকলেই যে আমাদের খুশী করেছেন এমন কথা বলা গেল না।

বরং ভাল লেখা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত অল্প পরিচিত কবি স্নেহাকর ভট্টাচার্যের বিভাবে প্রকাশিত কবিতাগুচ্ছের বিশেষ উল্লেখ করতে চাই। জানিনা স্নেহাকরের বয়স কতো? তরুণ হলে বিশেষ ভাল লাগাটা চট করে জানাতেও নেই। তবু না বলে পারছিনা, এমন গনগনে জ্যান্ত কবিতা বহুকাল পড়িনি! তার কবিতাগুচ্ছের প্রতিটিই যে অনবদ্য এমন বলা যাবেনা। কিন্তু তবু কি সব মূল নাড়া দেওয়া লাইন। মনে হয় ভিতরে ভিতরে এই কবি যেন আগ্নেয়গিরি লালন করে চলেছেন। যেন আত্মধ্বংসই এ কবির কাম্য। আহা তা যেন না হয়। বিশেষ করে বারবার মনে পড়ছে শেষের 'ভালবাসা' নামের দীর্ঘ অসাধারণ প্রেমের কবিতাটিকে। এটি পড়ার পড় সাতদিন আমি ইচ্ছে করেই আর অন্য কবিতা পড়িনি।

শুভেচ্ছাসহ

অনুপ চৌধুরী

কল্যাণী—বি ব্লক। নদীয়া

সম্পাদকীয়

বিভাব শেষ বেরিয়েছিল সেই সেপ্টেম্বরে। তারপর এই সংখ্যা। মাঝখানে ছয় মাসাধিককালের ব্যাপক ব্যবধান। মাসের পর মাস ছাপাখানার ধর্মঘট, বিদ্যুতের শোচনীয় অনিশ্চয়তা, কাগজের যা-ইচ্ছে তাই মূল্য বৃদ্ধি ও দুঃপ্রাপ্যতা—গ্রাহক ও পাঠকপাঠিকাকে এর পর বোধহয় আর বলার কিছু থাকে না। তবু বিভাব বেরুবেই এই স্থির প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখছি! বিদ্যুৎ পর্যাপ্ত না হয়ে ওঠা পর্যন্ত অনিয়মিত প্রকাশটাই হবে স্বাভাবিক। ক্ষীণ আশা আছে অগাষ্টের পর পরিস্থিতির হয়তো উন্নতি ঘটবে এবং বিভাবের প্রকাশও পুনরায় নিয়মিত করে তোলা যাবে। সুতরাং গ্রাহকদের শংকার কোন কারণ নেই। যুগ্ম-সংখ্যা প্রকাশিত হলেই তারা একসংখ্যা করে কাগজ বেশী পাবেন।

গত সংখ্যার পর ছ মাস কেটে গেছে। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ নামক মহাদেশটির রাজনৈতিক আবহাওয়া হয়ে উঠেছে আরো অনিশ্চিত। কেন্দ্রশাসনে দলাদলি, গোষ্ঠীপ্রীতি, নেতাবদল, এখন নৈমিত্তিক। জানিনা আরো কি গভীর দুর্দিন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এভাবে চলে না, এভাবে চলতে পারে না। আজ হোক কাল হোক এই টুকরো ভাঙা অবস্থাটা শেষ ভেঙে যাবেই। জোড়াতালি কাপড়ে চলে, দেশপ্রেম নেতৃত্ব ও জনতাসেবায় ভণ্ডামি ও জোড়াতালি চলে না। গরুর জন্য বিনোবাজী অনশন করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বাধ্যও করান তা সমর্থন করাতে। অনশন না করে বিনোবা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে হেঁটে ঘুরে বেড়ালে দেখতে পেতেন, বাংলার মাঠে ঘাটে যে অগুন্তি চতুষ্পদ ঘাস খেয়ে বা না খেয়ে ঘুরে বেড়ায়, তারা জ্যান্ত কংকাল ছাড়া কিছু নয়। তাদের খাইয়ে দাইয়ে গাভী করে তোলার দায়িত্ব কি বিনোবাজী নেবেন! বিংশ শতাব্দীর প্রান্তপ্রদেশে বসে এইসব হিন্দু ভাবালুতার জন্যই এ দেশের

কিছু হচ্ছে না। বিনোবার এই অনশন রাজনৈতিক ব্ল্যাক মেইলিং-এর এক হাস্যকর নিদর্শন হয়ে রইল।

মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই আমরা পর পর হারিয়েছি বনফুল, কমল কুমার মজুমদার ও দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এঁরা সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল মানুষ ও সার্থক কথাশিল্পী ছিলেন। এর মধ্যে কমল কুমার ও দীপেন্দ্রনাথ-এর সঙ্গে বিভাবের আত্মিক যোগাযোগ ছিল নিবিড়। বনফুল ছিলেন বাংলা-সাহিত্যের এক দেদীপ্যমান আলোকস্তম্ভ। পরিণত বয়সে প্রয়াণের আগে তাঁর দেবার প্রায় সবকিছুই তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন। কমল কুমার লিখতেন অতি কম; এই মহান গদ্য শিল্পী বাংলা ভাষায় ছিলেন স্বয়ম্ভু। সম্পূর্ণ মৌলিক নিজস্বরীতির বাক্যগঠন ও অদ্ভুত যতিপ্রণালীতে গাঁথা তাঁর রচনার ভিতর থেকে সবসময়ই এক দুর্লভ কবিত্বের আলো বিচ্ছুরিত হতো। অথচ চলতি পরিচিত গদ্যভঙ্গীতেও আগে তিনি সার্থক গল্প লিখেছেন, লিখতে পারতেন। কিন্তু মধ্যবয়সে এসে সম্পূর্ণ সচেতনভাবে লিখনশৈলী পাল্টে নিয়েছিলেন। হয়তো শুধু লেখকদেরই তিনি তাঁর লেখা পড়াতে চাইতেন! তাঁকে যে লেখকদের লেখক বলা হয় তাতে হয়তো কিছুটা সত্যের ইঙ্গিত রয়েছে। দীপেন্দ্রনাথ একসময় আমাদের নিঃশ্বাসের মতো কাছের মানুষ ছিলেন। লেখক হিসেবে তিনিতো যোগ্য ছিলেনই, মানুষ দীপেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর চেয়েও বিশাল ও বহুগুণ ব্যাপক। সবচেয়ে বড় কথা, সমস্ত জীবন রাজনীতি-সংস্পৃক্ত থেকেও কখনই তিনি তাঁর সাহিত্যকে রাজনীতি দ্বারা আচ্ছন্ন বা আক্রান্ত হতে দেন নি। আমরা বনফুল, কমল কুমার, ও দীপেন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাই গভীর শ্রদ্ধা, প্রণাম ও ভালবাসা।

পূর্ব বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বিভাবের এ সংখ্যাই "দিলীপকুমার গুপ্ত" বিশেষ সংখ্যা হওয়ার কথা ছিল। প্রেস দুর্ঘটনা, বিদ্যুতের অনিশ্চয়তার জন্য বাধ্য হয়েই তার প্রকাশ পেছুতে হলো। তা ছাড়া যে বিখ্যাত প্রেসটি থেকে সংখ্যাটি ছাপার কথা ছিল তা দীর্ঘদিন বন্ধ। সরকারী অধিগ্রহণেরও কথা চলছে। যা হোক, বা যে করেই হোক, অগাষ্টের মধ্যে বিশেষ সংখ্যাটি অবশ্যই প্রকাশিত হবে। দিলীপ কুমারের গুণমুগ্ধ যে সব বিখ্যাত লেখকরা লেখা দিয়েছেন তাদের কাছে এবং পাঠকদের কাছে এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গীতাঞ্জলি • নৈবেদ্য

পকেট সংস্করণ : দু'টি বই একটি প্যাকেটে। মূল্য ৫·০০ টাকা

গীতাঞ্জলি ও নৈবেদ্য গ্রন্থ দু'টির পকেট সংস্করণ পাঠক সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। তাঁদেরই আগ্রহে গ্রন্থ দু'টি পুনরায় প্রকাশ করা হচ্ছে। গ্রন্থ দু'টির মূল্য যতদূর সম্ভব কম ধার্য করা হয়েছে বলে সর্বসাধারণকে কোনো কমিশন দেওয়া সম্ভব হবে না — পুস্তকবিক্রেতারা শতকরা দশভাগ কমিশন পাবেন।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

দীর্ঘকাল পরে এখন এ-পর্যন্ত প্রকাশিত সব কয়টি খণ্ডই পাওয়া যাচ্ছে। ২৭টি খণ্ড, অচলিত সংগ্রহ ২টি খণ্ড এবং প্রথমছত্র ও শিরোনাম-সূচী— মোট ৩০টি খণ্ডের মূল্য

কাগজের মলাট ৮৮৯·০০ টাকা
রেক্সিনে বাঁধাই ১০৭২·০০ টাকা

খণ্ডগুলি স্বতন্ত্রভাবেও সংগ্রহ করা যায়।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭
বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী

প্রেস ধর্মঘট ও বিদ্যুৎ সংকটের জন্য বিশেষ 'দিলীপ গুপ্ত সংখ্যা' বিভাব প্রকাশে অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে। আগামী অগাষ্টের শেষে অবশ্যই প্রকাশিত হবে।

বিভাব

বিশেষ দিলীপ গুপ্ত স্মরণ সংখ্যা

সম্ভাব্য লেখক সূচী

প্রেমেন্দ্র মিত্র
কমলকুমার মজুমদার
নীলিমা দেবী
পুলিনবিহারী সেন
সত্যজিৎ রায়
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
রাধাপ্রসাদ গুপ্ত
লীলা মজুমদার
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সমরেশ বসু
নরেশ গুহ
অরুণকুমার সরকার
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সুধীর রায়চৌধুরী
প্রতিভা বসু
নৃপেন্দ্র সান্যাল
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
চিদানন্দ দাশগুপ্ত
গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
দীপক মজুমদার
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
মিহির দাশ
পূর্ণেন্দু পত্রী
রঘুনাথ গোস্বামী
গৌরী আইয়ুব দত্ত প্রভৃতি

সম্পাদক
নরেশ গুহ : অরুণকুমার সরকার
সংগঠক : নৃপেন্দ্র সান্যাল

॥ বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালার কয়েকখানি গ্রন্থ ॥

কাঁদিদ : ভলত্যার ৫·০০
মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ করেছেন ডঃ অরুণ মিত্র
গান্ধী রমঁ্যা রলঁ্যার দৃষ্টিতে : রমঁ্যা রলঁ্যা ৮·০০
গান্ধীর উপর রলঁ্যার যাবতীয় মুখ্য রচনা
অনুবাদ করেছেন ডঃ লোকনাথ ভট্টাচার্য
তার্তুফ : মলিয়ের ৪·৫০
মলিয়ের রচিত প্রহসনের বাংলা অনুবাদ করেছেন
ডঃ লোকনাথ ভট্টাচার্য
ব্যাঙের কেত্তন : আরিস্তোফানেস ৫·০০
আরিস্তোফানেসের শ্রেষ্ঠ কমেডি
অনুবাদ করেছেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
ওথেলো : শেক্সপীঅর ৪·৫০
অনুবাদ করেছেন সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়
জোনাথান সুইফট-এর গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত ১৫·০০
অনুবাদ করেছেন লীলা মজুমদার

সাহিত্য অকাদেমি
রবীন্দ্র স্টেডিয়াম
কলিকাতা-২৯ ৪৬ : ১৩৯৯

ভ্রমণ কাহিনী অনেক আছে। কিন্তু ভ্রমণসাহিত্য খুব কমই মেলে। একই সঙ্গে ভ্রমণ ও সাহিত্যরসের আস্বাদ খুব স্বল্প লেখকই করাতে পারেন। **দীপক-কুমার সরকার** তেমনই একজন লেখক। রূপতীর্থ রূপকুণ্ড, হোম কুণ্ড, নন্দন কাননে, পিণ্ডারীর পথে ও মেঘের দেশের লেখক এবারে লিখেছেন

বিপাশার জলসাঘরে

মূল্য : চোদ্দ টাকা

পরিবেশক :
দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

বিভাব

RN 30017/76
Declaration U/S 5 of the Press & Registration of Book Act.

১। প্রকাশের স্থান : ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস। কলি-১৭
২। প্রকাশের কালানুক্রম : ত্রৈমাসিক
৩। সম্পাদকের নাম : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
জাতীয়তা : ভারতীয়। ঠিকানা : ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস। কলি-১৭
৪। মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
জাতীয়তা : ভারতীয়। ঠিকানা : ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস। কলি-১৭
৫। স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা :
আরতি সেনগুপ্ত। ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস। কলি-১৭
আমি, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(স্বাঃ) সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

With best Compliments of

SHELLAC EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored by the Ministry of Commerce.
Government of India)

14/1B Ezra Street, Calcutta-700001

Phone : 26-5288
26-0010

Telegram : SHEXPROCIL

বিভাব সম্পর্কে

* বছরে চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হবে
* গ্রাহক চাঁদা, সডাক বার্ষিক বারো টাকা।
* ভি পি করা হয় না।
* লেখা মনোনীত হলে আমরাই জানাবো। ডাকটিকিট পাঠানোর প্রয়োজন নেই।

সম্পাদকীয় দপ্তর

৬, সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলকাতা—৭০০০১৭
টাকাকড়ি, বিজ্ঞাপন, গ্রাহকচাঁদা, কার্যালয়ের ঠিকানায় প্রেরিতব্য।
বিঃ দ্রঃ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার নিষ্প্রয়োজন।

BIVAV

SPECIAL COMBINED ISSUE
October-December 1978
January-March 1979

Price Rs. 3.00
Vol. 3 No. 2 and 3
Published in April 1979
RN 30017/76

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

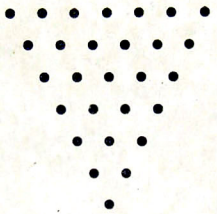

Phillips Carbon Black Limited

"Duncan House"

31, Netaji Subhas Road

Calcutta-700001